BANGLA SHISHU KISHORE SAHITYA O COMICS

MA [Bengali]

BNGL- 804E

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr Rejaul Karim

Authors

Nityananda Mandal: (Units 1& 2)

Aniruddha Biswas: (Unit 3)

Sacchidananda Majumder: (Unit 4)

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃষ্ঠা 1-28)

ক. শিশু

ভুমিকা,কবিতা আলোচনা (জন্মকথা, প্রশ্ন, মাস্টারবাবু, ছোটোবড়ো, সমালোচক, বীরপুরুষ,
জ্যোতিষশাস্ত্র, পূজার সাজ), ঋণস্বীকার, সাম্ভাব্য প্রাশ্নাবলী

খ. মুকুট

ভূমিকা ও 'মুকুট' পরিচয়, কাহিনী সংক্ষেপা, নামকরন, চরিত্র চিত্রন (যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য,
মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার, কনিষ্ট রাজকুমার রাজধর), ঋনস্বীকার, সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 29 - 58)

ক. সুকুমার রায় : হ য ব র ল

সুকুমার রায়ের সময় ও হ য ব র ল
বিষয়বস্তু পর্যালোচনা প্রথম গল্প, বিষয়বস্তু পর্যালোচনা দ্বিতীয় গল্প, বিষয়বস্তু পর্যালোচনা তৃতীয় গল্প
ননসেন্স এর হাতছানি, হ য ব র ল সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা, সংগীত ভাবনা, শিশু সাহিত্য পরিচয়, ঋন স্বীকার, সাম্ভাব্য প্রশ্ন

খ. অন্নদা শঙ্কর রায় : উড়কি ধানের মুড়কি

অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া ও পরিচিতি, ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য
উড়কি ধানের মুড়কি প্রকাশ ও কথামুখ, বিভিন্ন ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা, ঋন স্বীকার, সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

তৃতীয় একক : সত্যজিৎ রায় : প্রফেসর শঙ্কু (নির্বাচিত) (পৃষ্ঠা 59 - 92)

উদ্দেশ্য, ভূমিকা, শঙ্কু সমগ্রের নির্বাচিত গল্পগুলি সম্বন্ধে সাধারন আলোচনা (ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, স্বপ্নদ্বীপ,
একশৃঙ্গ অভিযান, শঙ্কুর শনির দশা, প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.), প্রোফেসর শঙ্কুর চরিত্র,
শঙ্কুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শঙ্কুর আবিষ্কার, হাস্যরস, সহায়ক গ্রন্থাবলী, সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

চতুর্থ একক : নারায়ন দেবনাথ (পৃষ্ঠা 93 - 119)

নারায়ন দেবনাথ এক বিরল প্রতিভা, উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা, কমিকস্ এর যাত্রা হল শুরু,
রচনা শৈলীর ক্রমবিকাশ, জনপ্রিয়তা, বইমেলা সম্পর্কে তার স্মৃতিচারনা, বিদেশী কমিকস্ এর প্রভাব,
কীভাবে তিনি বাটুল দি গ্রেটের কাজ শুরু করেন?, তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ ও অলংকরন যেন কথা বলে,
ব্যাক্তি নারায়ন দেবনাথ, নারায়ন দেবনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গুনী মানুষের অভিমত, সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী, উৎস

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃষ্ঠা 1-28)

ক. শিশু

ভূমিকা

কবিতা আলোচনা

জন্মকথা

প্রশ্ন

মাস্টারবাবু

ছোটোবড়ো

সমালোচক

বীরপুরুষ,

জ্যোতিষশাস্ত্র

পূজার সাজ

ঋণস্বীকার

সাম্ভাব্য প্রাশ্নাবলী

খ. মুকুট

ভূমিকা ও 'মুকুট' পরিচয়

কাহিনী সংক্ষেপা

নামকরন

চরিত্র চিত্রন

যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য

মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার

কনিষ্ট রাজকুমার রাজধর

ঋনস্বীকার

সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 29 - 58)

ক. সুকুমার রায় : হ য ব র ল

সুকুমার রায়ের সময় ও হ য ব র ল

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা প্রথম গল্প

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা দ্বিতীয় গল্প

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা তৃতীয় গল্প

ননসেন্স এর হাতছানি

হ য ব র ল সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা

সংগীত ভাবনা

শিশু সাহিত্য পরিচয়

ঋন স্বীকার

সাম্ভাব্য প্রশ্ন

খ. অন্নদা শঙ্কর রায় : উড়কি ধানের মুড়কি

অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া ও পরিচিতি

ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য

উড়কি ধানের মুড়কি প্রকাশ ও কথামুখ

বিভিন্ন ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা

ঋন স্বীকার

সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

তৃতীয় একক : সত্যজিৎ রায় : প্রফেসর শঙ্কু (নির্বাচিত)

(পৃষ্ঠা 59 - 92)

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

শঙ্কু সমগ্রের নির্বাচিত গল্পগুলি সম্বন্ধে সাধারন আলোচনা

ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

স্বপ্নদ্বীপ,

একশৃঙ্গ অভিযান
শঙ্কুর শনির দশা
প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.
প্রোফেসর শঙ্কুর চরিত্র,
শঙ্কুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
শঙ্কুর আবিষ্কার
হাস্যরস
সহায়ক গ্রন্থাবলী
সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

চতুর্থ একক : নারায়ন দেবনাথ (পৃষ্ঠা 93 - 119)

নারায়ন দেবনাথ এক বিরল প্রতিভা
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি
সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা
কমিকস্ এর যাত্রা হল শুরু
রচনা শৈলীর ক্রমবিকাশ
জনপ্রিয়তা
বইমেলা সম্পর্কে তার স্মৃতিচারনা
বিদেশী কমিকস্ এর প্রভাব
কীভাবে তিনি বাটুল দি গ্রেটের কাজ শুরু করেন?
তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ ও অলংকরন যেন কথা বলে
ব্যাক্তি নারায়ন দেবনাথ
নারায়ন দেবনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গুনী মানুষের অভিমত
সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
উৎস

টিপ্পনী

ভূমিকা

টিপ্পনী

আধুনিক ভারতীয় ভাষা গুলির মধ্যে বাংলা আন্যতম উন্মত ভাষা। প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ চর্যাপদের যুগ থেকে মধ্যযুগের বাংলার স্তর পেরিয়ে উন্মত ও উৎকর্ষাত্ম এই বাংলা ভাষার বর্তমান বৈচিত্রময় প্রকাশ। 'বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য ও কমিকস্' মডিউলটি চারটি (৪) এককে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম এককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শিশু ও মুকুট সংযোজিত হয়েছে। প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু কবিতা ও মুকুট নাটকটির পাঠ বিশ্লেষণ করে পাঠক ও ছাত্র - ছাত্রীদের উপকৃত করার প্রচেষ্টা আছে এই মডিউলে।

দ্বিতীয় এককে সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের নির্বাচিত ছড়া উড়কিধানের মুড়কি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় এককে কল্পবিজ্ঞানের রচয়িতা সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর নিবাচিত কয়েকটি রচনা এই এককে স্থান পেয়েছে। চতুর্থ এককে কার্টুন শিল্পী নারায়ন দেবনাধের বাঁটুল দি গ্রেট এবং হাঁদা-ভোঁদা স্থান পেয়েছে যা পাঠক ও ছাত্র - ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখে 'বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য ও কমিকস্' মডিউলটি রচিত এবং প্রত্যেকটি এককের পরে সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপকৃত হবে বলে আশারাখি।

প্রথম একক শিশু (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

টিপ্পনী

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কবিতা রচনা দিয়েই তাঁর কাব্য জগতে আবির্ভাব। প্রথম দিকে 'জলপড়ে পাতা নড়ে' দিয়ে কবিতার সূত্রপাত হলেও নেহাৎ ই তা ভাবাবেগে আটকে থাকে নি। দার্শনিক কতত্ত্ব ও চিন্তা চেতনা ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্র কাব্যধারায় নবতর মাত্রা সংযোজন করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ - "সন্ধ্যা সংগীত' (১৮৮২) 'প্রভাত সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। এখানে ভাবাবেগ বেশী করে ধরা পড়ে। আবার 'মানসী' (১৮৯০); 'সোনার তরী' (১৮৯৪); 'বিচিত্রা' (১৮৯৬)' 'চৈতালী' (১৮৯৬) তে এসে রবীন্দ্র কাব্যধারা সুষমা মন্ডিত হয়েছে। কাব্য নবনব তত্ত্ব ও আদর্শ ধরা পড়েছে। এই ধারার পপরবর্ত্তী ভাবনা সমন্বিত কাব্য গ্রন্ধ 'কথাও কাহিনী' (১৯০০); 'কল্পনা' (১৯০০); 'ক্ষনিকা' (১৯০০); 'নৈবেদ্য' (১৯০২); 'স্মরণ' (১৯০২-০৩); 'শিশু' (১৯০৩; 'উৎসর্গ' (১৯০৪); 'খেয়া' (১৯১০)। এর পরেই রবীন্দ্র কাব্য ধারায় আধ্যাত্ম পর্ব সংযোজিত হচ্ছে ল এই ধারাব 'গীতাঞ্জলী' (১৯১০); 'গীতিমাল্য' (১৯১৪); 'গীতালী' (১৯১৪) । পরবর্তীতে রবীন্দ্র কাব্যধারায় পতিবাদ সংযোজিত হয়েছে। সেখানে 'বলাকা' (১৯১৬); 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২); পূরবী (১৯২৫) । শেষজীবনে 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০); 'রোগশয্যায় (১৯৪০);' আজরোগ্য (১৯৪১); জন্মদিনে (১৯৪১)।

মূলত দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে 'শিশু' কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। স্ত্রী মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা রেনুকা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হলে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তাকে আলমোড়ায় রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কয়েক মাস বাস করেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ শিশুপুত্র শমিন্দ্রনাথ ও ছিল। 'শিশু' কাব্য গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতা এই আলমোড়া থাকা কালিন রচনা করেন। শিশু মনের নবনব চিন্তা চেতনা ধরা পড়ে এখানে সেই সাথে শিশু মনস্তত্ত্বটি নিখুঁত ভাবে উঠে আসে এই কাব্য গ্রন্থে। যদি বইয়ের কারণ হিসেবকে উঠে আসে পীড়িতা কন্যা ও শিশু পুত্রের মনোরঞ্জন। কিন্তু এই কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তার অন্তরের একটা তাগিদ ছিল। বলা যায় রবীন্দ্রনাথের - সদ্যোমৃতা পত্নীর শোক, মাতৃহারা কন্যার আসন্ন মৃত্যু, এবং শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে জটিল পরিস্থিতি রবীন্দ্র নাথের মনকে এক গভীর বেদনায় ভরিয়ে তোলে। সেই বেদনা ও দুশ্চিন্তার হাত

টিপ্পনী

থেকে মুক্তি লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ শিশু কাব্যগ্রন্থটি রচনায় মনোযোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যের ও শ্রেষ্ট সম্পদ। শিশু মনের বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ এই শিশু কাব গ্রন্থটি। কাব্যটি সম্পর্কে জানা যায়-

"স্ত্রী বিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহকে বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড় ছিলেন তখন একটি নূতন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শিশু। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীনা শিশুপুত্র শশী, কাবিরকাছে মাতার ও পিতার উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ন হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবন বালক হৃদয়ের সুখ দুঃখ জাগিআ এই কাব্য শিশু জীবনের আনন্দলোককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।" (রবীন্দ্র কাব্যগপ্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা - ৭৩; পৃ. নং - ১৪৮)

কবিতা আলোচনা

(ক) জন্মকথা

শিশু কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতাটি শিশু ও তার মায়ের মধ্যে রহস্যময় সম্বন্ধের কথা স্মরণ করায়। সে সম্বন্ধ কবিকে মুগ্ধ করে। কবিতার শুরুতে শিশু তার মাকে প্রশ্ন করে -

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

ভাবতে অবাক লাগে এই প্রশ্ন শিশু মনের কোন রহস্যের সন্ধান দেয়। তবেকি শিশুর জন্মকথা মায়ের কাছে যতটা বিস্ময়ের শিশুর নিকটে ও ঠিক তেমনি রহস্যের জন্ম দেয়।

'মা' শিশুর এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ও দিয়েছে। আর স্নেহ, মায়া, মমতা সবই উজাড় করে 'মা' তার কযথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে - "ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।" মনের অন্তস্থল থেকে শিশুর যে উৎস তা তার 'মা' জানিয়ে দেয়। সেই সাথে আরো বলে-

"ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।"

মা একে একে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। সেখানে মা জানায় শিশু তার পুতুল খেলায় সাথী ছিল। জীবন প্রভাবে 'মা' যখন শিবপূজায় রত ছিল তখনও শিশু মায়ের সাথে রছিল। মা আরো বলে যে সে, তার শিশুকে অর্থাৎ সন্তানকে নিত্য নূতন ভাবে ভেঙেছে আর গড়ে তুলেছে নব নব ভাবে। শিশু ছিল মায়ের হৃদয়ের ঠাকুরে সনে। ছিল পূজার সিংহাসনে। 'মা 'যখন তার ইষ্ট দেবতার পূজা করেছে, সেই সাথে 'মা' তার শিশুর ও পূজা করেছে।

মা আরো গভীর ভাবে জানিয়েছে, যে আমার মাতৃত্বের আশার আলোয় শিশু লুকিয়ে ছিল। মায়ের সকল ভালোবাসায়, মায়ের 'মা' এবং তার দিদিমায়ের পরানে মাঝে এই শিশু লুকায়িত ছিল। সেই সাথে 'মা' আরো জানিয়েছে যে মায়ের পূর্বপুরুষদের যে পুরানো ঘরে যে 'গৃহদেবী' আছে। সেই ' 'গৃহদেবীর কোলের' মাঝে শিশু বহুযুগ যুগ ধরে লুকিয়ে ছিল। সেখানে ডুব দিয়ে 'মা' শিশুকে এই পৃথিবিতে এনেছেন।

মা শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যখন যৌবন পদার্পন করেছে। যখন মায়ের হিয়া। সঠিক ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তখন মায়ের জীবনের রূপ, রস, গন্ধের মধ্যে অর্থাৎ সকল ভালো সৌরভের মধ্যে শিশু অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ছিল। সেখানে থেকে মা জীবনের সমস্ত আনন্দ ধারা বিলিয়ে শিশুকে নিয়ে এসেছে।

এত কথা বলার পরেও মায়ের মন তৃপ্ত হয়নি। তাই 'মা' শিশুর প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতে তৎপর হয়। মা সেখানে বলে-

"সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী"-

সিন্ধু সেঁচে যেমন ভাবে মুক্ত আনা হয়। মা ও ঠিক তেমনি আবে হৃদয় নিঙড়ে শিশুকে এই পৃথিবীতে আনায়ন করেন। মায়ের হৃদয়ের সকল আদরের ধন এই শিশু।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পৃথিবীর আদিম কাল থেকে যেমন ভাবে শিশুরা পৃথিবী আসে মা ঠিক তেমনি ভাবে শিশুকে পৃথিবীতে আনায়ন করেন। তাই শিশু নিত্যকালের হয়েও চির পুরাতন থকে গেছে। জগৎ সংসারের আনন্দ স্রোতে শিশু নতুন হয়ে জগতে স্বপ্ন পুরনের জন্য মায়ের কোলে বসেছে। মায়ের অপূরনীয় সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করতেই শিশুর জন্ম।

তবু মায়ের মন ভরে না। মায়ের মনে বিস্ময় জাগে। তাই মা আবার বলে - "সবার ছিলি আমার হলি কেমনে"। শিশুযে বিশ্ব চরাচরের তা মা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে। তাই মায়ের মনে আবার প্রশ্ন উঁকি দেয়। যে প্রশ্নের একটা চুল চেরা উত্তর ও মা খুঁজে নেয়। সেখানে মা বলে -

"ওই দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।"

শিশুর জন্মের পরেও মায়ের মনে এক ভয় থাকে। শিশুকে হারানোর ভয়। সেই ভয় থেকে 'মা' মুক্ত হতে পারে না। তাই মায়ের আকুল আবেদন -

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানি না কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীন বাহু দুটির আড়ালে।"

-এই প্রশ্ন শুধু শিশুর মায়ের নয় ; সমগ্র মাতৃজাতির সেই সাথে আমাদেরও। শিশুর জন্ম রহস্যের সদ্ উত্তর বিজ্ঞান সঠিক ভাবে দিতে পারে না। কবি দেবে কি করে। তাই কবি তার অনুমান নির্ভর কতকগুলি দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন মাত্র এই কবিতাটিতে। শিশুর জগৎ আর আমাদের জগৎ সম্পূর্ন আলাদা, কারন আমাদের চেনা জগতের বাসিন্দা শিশু হতে পারে না। শিশু রুপকথার জগতের সঠিক বাসিন্দা। কারণ শিশুর জগতে বাস্তব ও কল্পনার সীমা সুনিদিষ্ট থাকে না, শিশু সত্য ও সপ্নকে এক করে বাঁধতে চেষ্টা করে। তার রাজ্যে সবই সম্ভব। অসম্ভবের স্থান সেখানে নেই। অবাস্তবকে শিশু সব সময় সত্য বলে ভাবে ল তাই কবির ভাষায় -

"খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তঃপুরে"

-কবির ভৌগলিক তত্ত্ব অনুসারে শিশু জগৎ মায়ের অন্তঃপুর থেকে উঠে আসে। জগৎ মাতা ও জগঃ পিতার রাজ্যের বাসিন্দা এই শিশু। তাই সেখানে থেকে মা শিশুকে নিয়ে আসেন অতিযতনে। অতি সতর্কভাবে। অতি সন্তর্পনে। সকল কালো বিদায় দিয়ে, সকল ভালোর সাথে।

টিপ্পনী

(খ) প্রশ্ন

প্রশ্ন কবিতাটিতে শিশুকে অনেকটা ভারিয়ে তোলে। কঠিন বাস্তব জগতের আবেষ্টনীর ঘেরাটোপে শিশু ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছে। তার চারিপাশ বাস্তব জগতের আবছা আলোয় সীমাবদ্ধ। তাই বাস্তবেদর এই বাঁধা ধরা নিয়ম থেকে শিশু বেরিয়ে আসতে চায়। তার সেই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে থাকে বিস্তর ফাঁক। তবু শিশু তার খেলার জগতে প্রবেশ করতে চায়। নিয়মের গন্ডি সে ভাঙতে চায়। স্বাধীনভাবে উড়ে যেতে চায়। কল্পনার জগতের বাসিন্দা হতে চায় সে। রূপকথার রাজ্যে যেতে চায় শিশু। বাঁধা ধরা নিবম থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বলেই তার মনে প্রশ্ন জাগে। ভাব ও কল্পনার সীমাহীন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য সে ছুটি খোঁজে। তাই মাকে সে নির্দিধায় বলে-

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।"

-পাঠশালার আবদ্ধ জীবন আর ভালো লাগে না শিশুর। তাই সে ছুটি চায়। তার কল্পনার রাজ্যে যে সবই সম্ভব তা মাকে স্মরন করায়। মা শিশুকে ছুটি না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে। কখনো বলে এখন দুপুর। এই দুপুরের রৌদ্রে ঘোরা যাবে না। মায়ের এই 'না' রাজ্য থেকে 'হ্যা' রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় শিশু। তাই সে মাকে বলে-

"তুমি বলছ দুপুর এখন সবে
হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনও কি দুপুর বেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই।"

টিপ্পনী

সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকে চায় না শিশু। তার মন যে মুহূর্তে উড়ে যেতে চায়, সে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে রাজি থাকে। যদি মায়ের কাছে সেটা দুপুর হয়, তবু মা কেন দুপুরটা বিকেল ধরে নেয় না। দুপুর, বিকাল, সকাল, সন্ধ্যা সবই শিশুর কাছে একই। কোন প্রভেদ সে করতে রাজী থাকে না। তাই শিশু ভাবতে থাকে এখন মাঠের পরে সূয্যি ডুবে গেছে, বাগদী বুড়ি পুকুর পাড়ে শাক তুলতে এসেছে। আধার গাছের নীচে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। সূয্যি ডুবে যাবার জন্য দিঘির জল কালো হয়ে গেছে। হাটের থেকে সবাই ফিরে এসেছে। মাঠের থেকে চাষীরা ফিরে এসেছে, সেই সাথে মাকে শিশু আরো বলছে-

"মনে করনা উঠল সাঁঝের তারা,
মনে করনা সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।"

শিশুর কল্পনার রাজ্যে সবই হওয়া সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই বাঁধা ধরা নিয়মের গন্ডিতে শিশু বাঁধা পড়ে আছে। সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই মায়ের 'দুপুর এখন সবে' এর উত্তরে মাকে শিশু বলছে মা তুমি ভেবে নিতে পার এখন সন্ধ্যা, বা গভীর রাত। যা শিশু মন কল্পনা করতে পারে। এভাবে প্রশ্ন কবিতায় শিশু তার মাকে সম্ভাব্যময় সম্ভবনার কথা বলে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছে।

(গ) মাষ্টারবাবু

মাষ্টারবাবু কবিতাটিতে কানাই মাস্টার শিশুকে যেভাবে পড়াতেন শিশুটি ঠিক সেভাবে কানাই মাস্টারকে অনুকরন ও অনুসরন করতে চেয়েছে। এখানে শিশুর মনে দুটি জগৎ রেখাকে স্পষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ ল আকটা বয়স্ক মানুষের জগৎ, আরেকটি শিশুর কল্পনার জগৎ। শিশু কানাই মাস্টার হয়ে বেড়াল ছানাকে পড়াতে তৎপর। আসলে এই বেড়াল ছানাকে? বেড়াল আসলে শিশুরই নামান্তর। মাস্টার যখন শিশুকে নিদিষ্ট করে কিছু পড়াতে চায়, বা বলতে চায় শিশু তখন তার নিজস্ব কল্পনার রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে ঘুরে বেড়াতে তৎপর হয়। তাই বেড়াল ছানাকে পড়াতে বসে শিশু কি করে তার দৃষ্টান্ত যেমন দিয়েছে, তেমনি মায়ের কাছে কৈফিয়ৎ ও দিয়েছে বেড়ালকে না মারার কথা বলে-

"আমি যে ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।

রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন শোন'।
দিন রাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা
আমি বলি 'চ, ছ, জ, ঝ, ঞ'
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ।"

শিশুর ছাত্র বেড়াল প্রতিদিন দেরি করে পড়তে আসে, পড়াতে মন না দিয়ে পা তুলে শুধু হাই তুলতে থাকে। শিশু যতই তার পড়াতে মনোযোগ করতে বলুক না কেন বেড়াল শুধু খেলা খেলা করে কাটিয়ে দেয়। সেই সাথে লেখা পড়ায় অবহেলা করে কেবলই নিজের মনে 'মিয়োঁ' 'মিয়োঁ' বলে ডাকতরে থাকে। আসলে এই বেড়াল তো শিশুর নামান্তর। ভালো করে ভেবে দেখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শিশুর সমকস্ত গুনাবলী বেড়ালের মধ্যে আরোপিত হয়েছে যেন এই কবিতাতে।

চুরি করতে নেই, গোপালের মতো ভালো ছেলে হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু মাছ দেখললে বেড়ালের আর কিছু মনে থাকে না। কিম্বা চড়াই পাখি দেখলে -"ছুটে যায় সব পড়া ফেলে"। আর দুষ্টুমি করে কেবল মিয়োঁ মিয়োঁ বলে ডাকতে থাকে।

মাষ্টার যেমন ছাত্রকে উপদেশ দেয় যে, পড়েয় সময় পড়তে হয় আর ছুটি হয়ে গেলে খেলতে হয়। তখন বেড়াল মুখবুজে ভালোমানুষের মতো শোনার ভান করে। কিন্তু -

"একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ।"

(ঘ) ছোটো বড়ো

ছোটো বড়ো কলবিতাটি 'আলমোড়া' থাকা কালিন ২৮শে শ্রাবন ১৩১০ সালে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রচনা করেন। কবিতাটি শিশু, তার বাবা ও দাদা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। শিশু তার বাবার মতো বড়ো হলে সে দাদা ও বাবাকে কি কি বলতে পারে বা বলবে তা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে 'মা', 'মামা' প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবি শিশুর কল্পনার রাজ্যে বিচরন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবিতার শুরুতে শিশু স্বীকার করেছে-

"এখনো তো বড়ো হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলে মানুষ বলে।
দাদা চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড় হয়ে বাবার মতো হলে।"

স্পষ্টত শিশু এখন ছোট আছে। তবে সে যদি বাবার মতো বড়ো হয় তবে সে দাদার সাথে কি রকম আচরণ করতে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। অর্থাৎ শিশু তখন বাবার স্থান অধিকার করে বসেছে। সে তার দাদাকে পড়তে না চাওয়ার জন্য বকে দেবে। আর পাখি ছানা খাঁচায় রাখলে বকা খেতে হবে দাদাকে। দাদকে 'দুষ্টু ছেলে' বলে বকে দেবে। সেই সাথে শিশুর সাধের কথা বলতে ও ভোলে না। পাখির ছানা পোষার জন্য দাদাকে বকবে। অথচ-

"তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পূষব পাখির ছানা।"

বিচিত্র এই শিশুর মন তাই যে কাজের জন্য দাদাকে বোকা খেতে হবে। সেই কাজ সে নিজে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকবে, কারন শিশু বাবার মতো বড়ো হয়ে গেছে। তাকে বোকা দেওয়ার তখন আর কেউ থাকবে না।

সকাল সাড়ে দশটার সময় শিশুকে স্নান সেরে পড়া করতে বসতে হয়। বা পাঠশালায় যেতে হয়। কিন্তু শিশু বাবার মতো বড়ো হলে নাওয়া, কাওয়ার জন্য কেউ তাড়া দেবে না। কেউ কাজের কথা বলবে না। তখন সে মুক্ত মনা। তাই শিশু তখন-

"ছাতা একটা ঘাড়ে করে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।"

পাড়া বেড়ানোর সাধ শিশুর মনে আজন্ম লালিত। যা কখনো পুরন হয় না। বড়ো কেবলই মানা করতে থাকে। এটা করিস না, ওটা করিস না বলে। কিন্তু শিশু বড়ো হয়ে

গেলে বারন করার কেউ থাকবে না। আবার গুরু মশাই পড়াতে আসলে, বাড়ির লোককে চৌকি পেতে দিতে বলবো। তিনি শ্লেট নিয়ে পড়তে বসতে বললে, বলবো আমি তো খোকা নেই বাবার মতো বড়ো হয়ে গেছি। তখন গুরুমশাই বলবে -

"বাবু মশায়, আসি এখন তবে"

বিকালবেলা মাঠে নিয়ে যাওয়ায় জন্য ভুলু যখন আসবে, তখন তাকে ধমক দিয়ে কাজের কথা শোনাবো। আবার রথের মেলায় ভিড়ের মাঝে শিশু একলা রথ দেখতে যাবে। মামা যদি ছুটে এসে শিশুকে কোলে নিতে চায় তখন মামাকে থামানোর যথাসম্ভব উত্তর ও তার মুখে সাজিয়ে রাখা আছে। সেখানে মামাকে শিশু বলবে -

"দেখছ না কি মা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
দেখে দেখে মামা বলবে, তাই তো
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।"

খোকা যেদিন প্রথম বড়ো হবে সেদিন সে বাবার মকতো সিকে টাকা বিলিয়ে দেবে, মা গঙ্গা স্নান সেরে এসে যদি খোকাকে খিছু বলে, তবে সে মাকে বাবার মতো টাকা এনে দেওয়ার কথা বলে। আশ্বিন মাসে গাজনতলার হাটে মেলা বসবে। বাবার নৌকা বাবুগঞ্জের ঘাটে ভিড়বে। তারা খোকার কথা ভেবে রঙীন জামা ও জুতো কিনে আনবে। কিন্তু খোকা জামা জুতো নিতে অস্বীকার করবে -

"আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

এইভাবে শিশু কল্পনায় বাবার মতো বড়ো হয়ে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে ভুলতে চেষ্টা করে।

(ঙ) সমালোচক

সমালোচক কবিতাটিতে খোকা তার বাবার সমালোচনা করেছে। বাবা লিখে লিখে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তার মাকে শোনায়। অথচ খোকা সব বুঝতে পারে না। মা যে ঠিক ঠাক বোঝে সেকথা সত্যি করে বলা যায় না। কারন বাবা যখন লেখা পড়ে মাকে শোনাচ্ছিল, খোকা তখন মায়ের মনোভাব দেখে বুঝতে পারলো যে মা তার বাবার লেখার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারে নি। তাই খোকা মাকে প্রশ্ন করে-

"সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে
বুঝেছিলি? - বল্ মা সত্যি করে।"

মা খোকার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। তবু খোকার মনে হয়, তার মা তাকে গল্প করে যা শোনায়, তা বাবা কেন লেখে না। বাবর মা অর্থাৎ 'ঠাকুমা' কি বাবাকে কোন রুপকথার রাজকন্যা, রাজপুত্র গল্প শোনায় নি। যা বা অকপটে লিখতে পারে। বাবা কি সে সব বেমালুম ভুলে গেছে। খোকা মাকে আরোল প্রশ্ন করে যে স্নানের বেলা হলে তুমি কেবলই বাবাকে ডেকে যাও। কিন্তু বাবা তার গুরুত্ব দেয় না। খাবার নিয়ে তুমি বসে থাকলেও বাবা তার কানেই তোলে না। কেবল-

"লেখা লেখা খেলা" করেই বাবা সময় অতিবাহিত করেন। আবার খোকা যদি বাবার ঘরে খেলতে যায় তবে তার মা 'দুষ্টু ছেলে' বলে বোকা কাঝোকা করে। সেই সাথে মা খোকা গোল করতে নিষেধ করে- "দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে"

খোকা মনে প্রশ্ন জাগে লিখে কি কখনো ভালো কিছু হওয়া সম্ভব। তাই খোকার মনে প্রশ্ন-

"বল্ তো, সত্যি বল্
লিখে কী হয় ফল।"

আবার খোকা যদি বাবার খাতা কলম নিয়ে লিখতে শুরু করে তখন মা রাগ করে। অথচ বাবা লিখতে বসলে মা কোন কথা বলে না। এটা খোকা কাছে অসহ্য লাগে। খোকা কাগজ, কলম নষ্ট করছে বলে মা রাগ দেখান, বকা দেন। অথচ বাবা প্রতিদিন দাগানো কাগজ নষ্ট করেন। তাতে মায়ের কিছু যায় আসে না ল তাই শিশুর মনে প্রশ্ন-

"বড়ো বড়ো রুল কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন নাকি রোজ।
আমি যদি নৌকা করতে চাই
অমনি বল, নষ্ট করতে না্ই

সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?"

সাদা কাগজ লিখে কালো করে বাব কোন ভালোআই না করছে। অথচ আমি যদি একটা নৌকা বানাতে চাই তখন বল কাগজ নষ্ট করতে নেই। নৌকা করা যদি নষ্ট হয় তাহলে বাবার মাথামুন্ড হীন লেখা, যা মা বা খোকা বুঝতে পারে না, তাতে কি কাগজ নষ্ট হচ্ছে না। এই প্রশ্নই ছুঁড়ে দেয় শিশু এভাবে শিশু বাবার লেখার সমালোচনা করে মায়ের কাছে।

(চ) বীরপুরুষ

শিশুকাব্য গ্রন্থের শিশুভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'বীরপুরুষ'। এখানে শিশু তার ভাবের রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাহসী বীর। একদল ডাকাতের সাথে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে সে তার মাকে উদ্ধার করে এনেছে। যা শিশু কল্পনায় অত্যন্ত প্রিয়। যে কথা বারে বারে বীরপুরুষ কবিতায় ধরা পড়ে। কবিতা শুরু শিশু বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে অনেক দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে। মা পালকি করে যাচ্ছে ল আর তার কোকা রাঙা ঘোড়া চড়ে টগবগিয়ে মায়ের পালকির পাশে পাশে যাচ্ছে। খোকার ঘোড়া এমনভাবে ছুতে চলেছে যে রাস্তার ধুলো যে কাশের মেঘের সাধে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা সূর্য পাটে গেছে, শিশু ও তার মা জোড়াদিঘির মাঠে পৌঁছে গেছে। জনমানব শূন্য জোড়াদিঘির পাড়ে পৌঁছে তার মা ভয় পেয়েছে বলে শিশু মনে করে। মাকে শান্তনা দিয়ে খোকা তাই বলে-

"ভয় কোরো না মাগো", আমি রূপ খোকা মায়ের সাথী। তাই মায়ের কোন ভয় পাওয়ার দরকার নেই। শিশু সেই সাথে আরো বলে, সনধ্যাবেলা রাস্তা চোরকাঁটাতে ঢেকে গেছে। কেউ সেখানে পৌঁছুতে পারবে না, বলে শিশু মাকে আশস্ত করে। এমন সময় একদল ডাকাত "হাঁরে রে রে রে রে" - করে এগিয়ে আসে মা পালকির এক কোনে লুকিয়ে ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করতে থাকে। আর পালকি বওয়া বেয়ারাগুলো কাঁটাবনের ঝোপের পাশে কাঁপতে থাকে ল তকন খোকা মাকে ডেকে বলে

"আমি আছি, ভয় কেন মা কর।"

ডাকাতদের বেহারা বেশ মজাদার। তাদের হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, সেই সাথে তাদের কানে জবা ফুল গোঁজা আছে। সেই ডাকতদের দেখে খোকা হেকে বলে-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"আমি বলি দাঁড়া খবরদার।
এক পা কাছে আসিস যদি আর -
টুকরো করে দের তোদের সেরে।"

একথা শুনে ডাকাত দল। লাফ দিয়ে উঠে মুখে বিশ্রীধরনের "হাঁরে রে রে রে রে।" আওয়াজ করতে থাকে। মা খোকাকে ডাকতদের সামনে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু খোকা মাকে চুপ থাকতে বলে। এবার খোকা তার মনোরাজ্যের -

"ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কতলোকের মাথা পড়ল কাটা।"

এভাবে শিশু তার মনো রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মায়ের আশঙ্কা ডাকতদের সাথে, কোকার একার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। খোকা হয়তো এই যুদ্ধে মারা যাবে। কিন্তু খোকার কল্পনার রাজ্যের নায়ক সে নিজে। তাই তার পরাজয় সম্ভব নয়। সে জয়ের মালা পরে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াবে। -

"আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, লড়ায়ই গেছে থেকে'
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছে আমায় কোলে -
বলছ ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল।
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।"

আর মা খোকাকে স্নেহপূর্ণ আদরে চুম্বনে খোকায় মনপ্রান ভরিয়ে তুলবে। সেই সাথে খোকা ছিল বলে মা শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। প্রতিদিন কতকি ঘটনা ঘটে। কিন্তু তার সবই সত্য হয় না। কিন্তু কোকার কল্পনায় এটা যদি সত্য হত তা হলে তা মন্দ হতো না। আর খোকার দাদার আশঙ্কা -

"দাদা বলত, কেমন করে হবে;
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ে কাছে।"

পাড়ার লোক খোকাকে ভরসা করলেও তার দাদা কোকাকে ভরসা করতে সাহস পায় না। অশঙ্কা করে খোকা দুর্বল বলে। কিন্তু রুপকথার রাজ্যে, বা খোকার কল্পনায়র রাজ্যে তার থেকে বড় বীর আর কেউ নেই। খোকার সেই কল্পনার রাজ্যের বিরত্বকে বরপুরুষ কবিতায় আর একবার প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে।

(ছ) জ্যোতিষ-শাস্ত্র

জ্যোতিষশাস্ত্র কবিতা শিশুর মনোজগতের পরিপূরক কবিতা। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সবকিছু হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্র যা বলে, বাস্তব অনেক সময় তা বলে না ল বাস্তবের সাথে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পার্থকভ বিস্তর। সেই বিস্তর ফারাক পুরন করে পারে এক মাত্র শিশু মন। কবিতার শুরুতে তাই পাই -

"আমি শুধু বলেছিলাম
কদম গাছের ডালে
পূর্নিমা চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধরে আনতে পারে।"

কিন্তু খোকার দাদা চাঁদ ধরে আনার কথা শুনে হাসতে থাকে। সেই সাথে কোকাকে বলে -

"খোকা, তোর মতো আর দেখি নাই কো বোকা।"

খোকা দাদা, আর খোকার চিন্তা চেতনার মধ্যে বাস্তব ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। খোকার দাদা, খোকাকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে চাঁদ অনেকদূরে থাকে তাকে কোনভাবেই ধরা ছোঁওয়া সম্ভব নয় ল কিন্তু খোকার দৃষ্টিতে অন্যকথা বলে। খোকার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দাদাকে জানায় যে দাদা তুমি কিছুই জান না। কারণ কোকার দৃষ্টিতে -

"মা আমাদের হাসে যখন
ওই জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলতে কি, মা
অনেক দূরে থাকে।"

খোকার দৃষ্টিতে 'মা' ও চাঁদ একাকার হয়ে গেছে। বাস্তবে যা অধরা, অসম্ভব বলে মনে হয়। খোকার কল্পনায় তা সম্ভব শুধু খোকার মায়ের নিরিখে। তাই কোকার কাছে 'মা' ই চাঁদ যে ধরা দেয়। মায়ের স্নেহ, মমতা, সবই অধরা চাঁদের নামান্তরে ফুটে ওঠা। কোকার দাদা খোকাকে আবার বলে যে বড়ো চাঁদ ধরতে গেলে বড়ো ফাঁদ দরকার। কিন্তু খোকার কাছে 'মা' ই তো 'চাঁদ'। তাই মায়ের মুখ দুই হাতে ধরে তো খোকা চাঁদের সোহাগ অনুভব করে। খোকা তাই দাদাকে শুধোয় তুমি আমাকে বোকা বলবে।

কবিতা তৃতীয় স্তবকে খোকা তার দাদার সব প্রশ্নের উত্তর এক সাথে দিয়ে দেয়। সেখানে খোকা তার দাদার বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করে বলে -

"মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।"

অর্থাৎ 'জ্যোতিষশাস্ত্র' কবিতাটিতে খোকার চাঁদ ধরা সম্ভব। খোকার দৃষ্টিতে 'মা' ই তার কাছে চাঁদ। তাই খোকার রূপকথার রাজ্যে 'মা' ও চাঁদ' সবই একাকার হয়ে যায়।

(জ) পূজার সাজ

'পূজার সাজ' কবিতাটি নাটকীয় ধরনের। কৃষক পরিবারে দুই ছেলে মধু ও বিধু। বাবা খুব কষ্ট করে দুই ছেলের জন্য সুতোর কাপড় কিনে আনে পূজোর উপহার হিসাবে ল কিন্তু বড়ো ছেলে মধুর তা পচ্ছন্দ হয় না। কিন্তু ছোট ছেলে বিধু পিতার দেওয়া উপহার অতিযত্নে গ্রহন করে। মধু রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আর বলে যায় -

"রায়বাবুদের গুপি পেয়ে জরির টুপি
ফুলকাটা সাটিনের জামা।"

সুতরাং মধুর ও সেই সাটিনের জামা চাই। মা মধুকে বোঝাতে চেষ্টা করে, যে এবছর ভালো ধান হবনি। ফসল সব নষ্ট হয়ে গেছে। তবু তোমাদেদর বাবা তোমাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এই উপহার কিনে এনেছে। তবু মধু রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রায় বাবুদের বাড়িতে গিবে সাটিনের জামা চেয়ে আনে। আর পাড়ের লোকদের তার পূজোর উপহার দেখাতে থাকে।

"গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় থেয়ে
হাসি আর নাহি ধরে মুখে।"

এতে মধু খুব খুশি হলেও মধুর বাবা মা বহু দুঃখ পায়। কারন মধু কাকা ও মামাকে সাটিনের জামা দেখায়। সেই সাথে বিধু ছিট কাপড় পরেছে বলে উপহাস করে। আর মধুর বাবা, মা কপালে করাঘাত করে বলতে থাকে -

"হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋন
কারো কাছে পাতি নাই হাত।"

মধুর বাবা, মা দরিদ্র্য হলে ও কখনো কারো কাছে ঋন রাখে না। আত্ম সম্মান বোধ বজায় রেখে তারা মাথা উঁু করে চলে। কিন্তু আজ তাদের ছেলে হয়ে মধু ভিক্ষ গ্রহন করে অহংকার করতে থাকে , এতে মধুর বাবা মার আত্ম সম্মানবোধে আঘাত লাগে। আর ছোট ছেলে বিধুকে নিয়ে গর্ব করে বলে -

"আয় বিধু, আয় বুকে চুমো খাই চাঁদ মুখে,
তোর সাজ সবথেকে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।"

এর থেকে আত্মতৃপ্তি বোধ হয় আর হয় না। তাই বড়োছেলে মধুর জন্য বাবা-মা যতটা কষ্ট পায়। ছোট ছেলে বিধুকে নিয়ে গর্ব বোধ করে সেই দুঃখ যন্ত্রনা ভুলতে চেষ্টা করে ল আর এভাবে পূজার সাজ কবিতাটি দুঃখের মধ্যেও শান্তির প্রলেপ দেয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঋনস্বীকার

(১) শিশু : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খন্ড ; বিশ্বভারতী দ. আচার্য জগদীশ বসু রোড় ; কলিকাতা - ১৭

(২) রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ : প্রমথনাথ বিশী ; মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা

(৩) রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; ওরিয়েন্টাল বুক প্রকাশন

সাম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) শিশু কাব্যগ্রন্থটি কতসালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি রচনায় প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

(২) জন্মকথা কবিতাটি মূল বক্তব্য বিষয় আলোচনা করো।

(৩) প্রশ্ন কবিতায় শিশু মনের প্রশ্নগুলির মূল্যায়ন কর।

(৪) মাস্টারবাবু কবিতা শিশু কানাই মাস্টার হলে কি কি করত তা আলোচনা করো।

(৫) ছোটোবড়ো কবিতা শিশু হঠাৎ বাবার স্থান পেলে কি কি করতো বলে তুমি মনে করো।

(৬) সমালোচক কবিতায় শিশু বাবার সমালোচনা করে কি মন্তব্য করেছে - তা ব্যাখ্যা করো।

(৭) বীরপুরুষ কবিতা শিশু কেমনভাবে তার মা কে ডাকাত দের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতো তা আলোচনা করো।

(৮) জ্যোতিষশাস্ত্র কবিতায় শিশুর চোখে চাঁদ আসলে কে বলে মনে করো।

(৯) পূজার সাজ কবিতায় যে নাটীক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনা করো।

প্রথম একক মুকুট (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

টিপ্পনী

ভূমিকা ও 'মুকুট' পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি। তবে কবিতা রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব ঘটলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। নাটকের যে বিচিত্র ধরনের শ্রেনীভেদ হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়েছেন। গীতিনাট্য - নাট্যকাব্য কাব্যনাট্য থেকে শুরু করে রুপক সাংকেতিক নাটক, তত্ত্ব নাটক, নৃত্যনাট্য - নাটিকা সর্বক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী। তার নাটক মূলত ভাবাত্মক, গীতিধর্মী তত্ত্বচিন্তাবাহী। সেইসাথে তার নাটক বারে বারে ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজ সমস্যা ও ব্যক্তিসমস্যার নতুন তত্তব ও তাত্ত্বিক প্রয়োগ।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'রুদ্রচন্দ্র', 'বল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শারোৎসব', 'রাজা'', মুকুট (১৯০৮)', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্র', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আবার রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাসকে নাটীকৃত করেন। মুকুট নাটকটি ও রবীন্দ্রনাথ তার ক্ষুদ্র উপন্যাস থেকে নাটীকৃত করেন।

মুকুট নাটকটি ১৯০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর যে কয়টি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন 'মুকুট' তার মধ্যে প্রথম। 'মুকুট' ক্ষুদ্র উপন্যাস রূপে 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকের দ্বারা অভীনিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এটিকে উপন্যাস থেকে নাটীকৃত করেন। মুকুট নাটকটি তিনটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্য রচনা করা হয়েছে। প্রথ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দশ্য বর্তমান। তিন অঙ্কের কাহিনী ধারায় নাট্য পরিনতি ত্র্যাজিক রুপ লা করেছে। ছোট রাজকুমার রাজধরের চক্রান্তের স্বীকার হয়েছে ত্রিপুরার যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের মৃত্যু আমাদের বিবেকের দংশনে দংশিত করে ।

কাহিনী সংক্ষেপে

নাটকের বিষয় বস্তুতে দেখা যায় ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্যের তিনপুতর।

টিপ্পনী

যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য, মধ্যমরাজকুমার ইন্দ্রকুমার এবং কনিষ্ঠ রাজ কুমার রাজধর। এই তিনজনের মধ্যে ছোটরাজকুমার রাজধর যুদ্ধকৌশল ঠিকঠাক আয়ত্বে না করার জন্য তাকে সকলে অবজ্ঞা করে। এমনকি অস্ত্র শিক্ষা গুরু ইশাখা রাজধরকে অপদার্থ হিসাবে গন্য করে। রাজ্যের প্রজারা তাকে রাজপুত্র হিসাবে গন্য করতে চায় না। রাজধরের ক্রিয়াকলাপ কেউই ভালো চোখে দেখে না। অবজ্ঞা আর অবহেলায় কারনে রাজধর ক্রমশ হীন ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে পড়ে। রাজধর কৌশল খুঁজতে থাকে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায় কি ভাবে। ইশাখাঁ একদিন রাজধরকে অপমান করলে সে রাজা অমরমানিক্যের কাছে প্রতিবাদ করে। সেই সাথে সে যে কোন ভ্রাতাদের থেকে যুদ্ধ বিদ্যায় কম পারদর্শী নন তা ও জানিয়ে দেয়। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য রাজধর নিজের পিতা তথা ত্রিপুরার রাজার কাছে প্রার্থনা করে - "মহারাজা নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহন করুন, এই আমার প্রার্থনা" - অতএব মহারাজা সর্বসমক্ষে ধনুর্বদ্যা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। প্রতিযোগিতার কথা শুনে যুবরাজ ও মধ্যরাজ কুমার ইন্দ্রকুমার উৎসাহ দেখালেও কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ততটা উৎসাহ দেখায় না, তবে তিনি কৌশল খুঁজতে থাকে। মহারাজ 'কালই' ধনুবিদ্যার পরীক্ষার দিন ধার্য্য করলেন। এদিকে রাজধর, তার মামাতো ভাই ধুরন্ধরের সহায়তায় রাত্রে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে দাদা ইন্দ্রকুমারের তূনের খোপথেকে তাঁর নামলেখা তীরটি তুলে নিয়ে সেখানেনিজের নামলেখা তীর রেখে আসেন। পরদিন যথারীতি ধনুবির্দ্যার প্রতিযোগিতা হল। সেখানে যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য তীর ঠিকঠাক স্থান পৌঁছতে পারে নি। মধ্যমরাজ কুমার ইন্দ্রকুমারের তীরে লক্ষভেদ করলে সকলে ইন্দরকুমারের 'জয়ধ্বনি' দিতে থাকে। আর কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের তীর ও লক্ষভেদ করতে পারেনি বলে সকলেই অনুমান করে। তবু রাজধর পিতার কাছে ঘোষনা করে যে তার তীর-ই নিদিষ্ট স্থানে পৌঁছেছে। সেই সাথে পরীক্ষা করার জন্য ইশাখাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ইশ খাঁ লক্ষ্য ভেদের স্থান থেকে ফিরে এসে জানায় যে কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের তীরই নিদিষ্ট স্থানে আছে ল কারন তার নাম লেখা তীরই মূল লক্ষ্যভেদ করেছে। ইন্দ্রকুমার বা চন্দ্রমানিক্যের তীর তার ধারের কাছে যেতে পারে নি। রাজা অমর মানিক্য এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পেলেও প্রমন স্বরূপ কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরকেই বিজয়ির পুরষ্কার দিতে বাধ্য হন। ইশাখাঁ যদিও একটা আঁচ করেছিল কোথাও না কোথাও একটা ভুল হচ্ছে ল সেই সঙ্গে ইশাখাঁ ইন্দ্রকুমারকে রহস্যের কারনও জিজ্ঞাসা করে। ইন্দ্রকজুমার জানত গত রাতে রাজধর লুকিয়ে তার অস্ত্রশালায় ঢুকে তীর পরিবর্তন করে রেখে এসেছিল। এখন ইন্দকুমার বুঝতে পারলো কেন গোপনে রাজধর তার অস্ত্রশালায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ইন্দ্রকুমার তখন বাপারটা সহজ ভাবে নিলেও এখন বুঝতে পারছে আসল ব্যাপারটা কি। এখন আর ইন্দ্রকুমারের কিছু বলা চলে না। তাই সে মুখ বুজে সবই মেনে নেয়। তার

নিরব থাকা মানে উন্দ্রকলুমার পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত মহারাজ অমরমানিক্য নিদিষ্টপরমান পাওয়ার পর কনিষ্ঠ রাজ কুমার রাজধরকেই বিজয়ী ঘোষনা করে তার হাতে হীরে বাঁধানো তলোয়ার পুরষ্কার হিসাবে তুলে দেন।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় অঙ্কে আরাকান রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্যের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অমর মানিক্য আরাকান রাজার বিরুদ্ধে তার তিন পুত্র তথা যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য, মধ্যম রাজকুমার ইন্দকুমার এবং কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরকেই নিয়োগ করেন। চন্দ্রমানিক্য ও ইন্দ্রকুমার সরাসরি যুদ্ধ স্থলে গিয়ে যুদ্ধ করলেও রাজধর যুদ্ধস্থান থেকে বহু দূরে পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে কলুকিয়ে থাকে ল যুদ্ধের সময় রাজধরের যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে রাজধর নাথেকে হীন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কারন রাজধর ভাবে যদি সে যুদ্ধে অংশগ্রহন করে এবং যুদ্ধে যদি জয়লাভ হয়। তবে সেই কৃতিত্ব যুবরাজ তথা চন্দ্রমানিক্যের উপর বর্তাবে। রাজধরকে কেউ তেমন ভাবে গুরুত্ব দেবে না। রাজধর মামাতো ভাই ধুরন্ধরের সহায়তায় কৌশল আয়ত্ব করতে থাকে। হীন ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে রাজধর রাত্রে কর্নফুলি নদী পার হয়ে শত্রুশিবির আক্রমন করে আরাকান রাজাকে বন্দী করে। আরাকান রাজা রাজধরকে জানাব যে যদি তাকে বন্দী করা হয় তবে যুদ্ধের অবসান হবে না। কারন আরাকান রাজার ভাই 'হামচু' রাজা হবে এবং যুদ্ধ ঠিক আগের মতোই চলতে থাকবে। এসব কোন কথার গুরুত্ব না দিয়ে রাজধর আরাকান রাজার মাথার মুকুট নিয়ে আসে সেই সাথে সন্ধি প্রস্তাব ও লিখে নেয়।

হীন ষড়যন্ত্রের বশবর্তি হয়ে রাজধর যে আরাকান রাজের 'মুকুট' নিয়ে এসেছে এই খবর চাউর হতেই মধ্যমরাজ কুমার ইন্দ্রকুমার রাজধরের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে বলে। কিন্তু যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য সঠিক ভাবে অবগত না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। রাজধর জানায় সে যুদ্ধ জয় করে 'মুকুট' নিয়ে এসেছে। কিন্তু ইন্দ্রকুমার বা ইশাখাঁ কেউই রাজধরকে মানতে রাজী থাকে আ। কুপুরুষ বলে রাজধরকেই অপমান করে। সেই সাথে যুদ্ধ জয়ের মুকুট যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের বলে দাবী করে। কিন্তু রাজধর সে যখন মুকুট এনেছে, তখন সেই মুকুটের দাবিদার সে নিজেই, অন্য কেউ নয়। যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যকে উন্দ্রকুমার ও ইশাখাঁ মুকুট পরাতে চাইলে যুবরাজ তা নিতে অস্বীকার করে। শেষপর্যন্ত সেনাপতি ইশা খাঁ, 'মুকুট' কর্নফুলির জলে নিক্ষেপ করেন। সেই সাথে ইশাখাঁ ঘোষনা করেন রাজধর হীন চক্রান্ত করে মুকুট এনেছে তাই তার শাস্তি প্রাপ্য। আর রাজধর এই অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

যুদ্ধ যখন সমাপ্ত ঘোষনা হয়েগেছে তখন রাজধর আবার ষড়যন্ত্র করে। এবার

টিপ্পনী

নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ধুরন্ধরকে দিয়ে আরাকান রাজার কাছে আবার গোপনে চিঠি পাঠায়। সেই সাথে আরাকান রাজাকে এও জানায় যে, সে তার ভাই দের থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দূরে থাকবে। সেই সাথে আরাকান রাজাকে আক্রমন করতে অনুরোধ জানায়। বলে যে এবার ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হতে বাধ্য ল কারন ইন্দ্রকুমার রাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। ত্রিপুরার সৈন্যরা ফেরার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে। এই সময় যদি আরাকান রাজা আক্রমন করে তবে তার জয় নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত রাজধরের কথা মতো আরাকান রাজ হঠাৎ ত্রিপুরার সৈন্যদের আক্রমন করে ল যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিপুরার সৈন্যদের পরাজয় ঘটে। সেনাপতি ইশা খাঁর মৃত্যু ঘটে।

তৃতীয় অঙ্কে যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য কর্নফুলি নদীর তীরে অর্জুন গাছের নীচে সে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। ইন্দ্রকুমার রাগ করে চলে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রাজধর বিবেকের দংশনে দংশিত হতে হতে বড় ভাই তথা যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুকুট তার পায়ে অর্পন করে। কিন্তু যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য জানায় তার মৃত্যুকাল উপস্থিত সুতরাং মুকুট প্রাপ্ত ইন্দ্রকুমারের। আর ইন্দ্রকুমারকেই মুকুট পরিয়ে দেন। এভাবেই মুকুট নাটক ট্র্যাজিক পরিনতি পায়।

নামকরন

নামকরন সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ন বিষয়। কেননা বৃক্ষের পরিচয় যেমন ফলে, সাহিত্যের পরিচয় তেমনি নামে। প্রতিভাধর সাহিতভিক গন এই জন্য সাহিত্যের নামকরনে বিশেষ যত্নবান হয়ে থাকেন ল সংস্কৃতে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তার সাহিত্য দর্পন গ্রন্থে নামকরন সম্বন্ধে বলেছেন-

"কবে বৃত্তস্য নবা নাম্মা নায়কস্য তরস্যবা।"

অর্থাৎ কবি বর্নিত কাহিনী বৃত্ত, আখ্যান, নায়ক বানায়িকার নাম অনুসারে বা তদারুপভাবে নামকরন হয়ে থাকে।

এখন আমরা মুকুট নাটকের কাহিনী বিশ্লেষন করে দেখবো এর নামকরন কতখানি যুক্তি সংগত হয়েছে। 'মুকুট' নামটির অভিধানিক অর্থ - কিইরীট বা শিরোভূষন। সংস্কৃত - মন্‌ক্ + উটন . কতৃ। বিঃ পু। নাটকের কাহিনীতে দেখবো রাজ শিরোভূষন কার প্রাপ্য এই নিয়েই দন্দ্ব ও তার পরিনতি নাটকের মূল প্রতিবাদ।

রাজার সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী কে কার ভাগভে রাজমুকুট জুটবে। আমরা সাধারনত দামি যে যোগ্য ব্যাক্তিই রাজ মুকুটের অধিকারী বা সিংহাসনের অধিকারী। ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য যোগ্য উত্তরাধিকারী যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য। চন্দ্রমানিক্যের রাজা হওয়ার সমস্ত গুনাবলী বর্তমান। সে ধীর স্থির যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। বিবেক ও বুদধিতে অপর রাজকুমারদের থেকে সে বেশী পরিমানে সচেতন। তবু বারবার তাকে চক্রান্তের স্বীকার হতে হয়। রাজপ্রাসাদের সকলে যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের ক্রিয়া কলাপে উৎফুল্ল থাকলেও কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর কোনভাবেই চন্দ্রমানিক্যকে মেনে নিতে পারে না। তাই রাজধর, ধুরন্ধেরর সহায়তায় চন্দ্রমানিক্যকে পরাস্ত করতে তৎপর হয়। রাজা অমরমানিক্যের কাছে রাজধর তার অপমানের প্রতিকার বিধানের কথা তুললে, রাজা সেনাপতি ইশা খাঁকে রাজধরের যোগ্য সম্মান প্রদানের কথা বলে। উত্তর স্বরূপ ইশা খাঁ জানায় যে, সে রাজধরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করে। কিন্তু রাজধর নিজের সম্মান নিজে বজায় রাখতে জানে না। ইশাখাঁর কথায় ক্ষুদ্ধ হয়ে রাজধর মহারাজা অমর মানিক্যের কাছে নিজের যোগ্যতার প্রদর্শনের পরীক্ষা দিতা রাজী হয়ে যায়। এই প্রস্তাবে ইশা খাঁ মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার উৎসাহিত হয়ে পড়ে। ইশা খাঁ ভাবে এবার রাজধর উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। সে যে একজনন অপদার্থ রাজকার্যচালানোর পক্ষে নেহাত নির্বোধ তা পরমাণ হয়ে যাবে। ইশাখাঁ, ইন্দ্রকুমার যখন এই চিন্তায় বিভোর ঠিক সেই সময় রাজধর মামাতো ভাই ধুরন্ধরের সহায়তায় অস্ত্রশালায় প্রবেশ করে তূনের খোপ থেকে তীর বদল করার কথা বলে। কারণ রাজধরের যুক্তিতে - "সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে ? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়।" তাই বুদ্ধির জেরে ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে রাজধর ইন্দ্রকুমারের তূনের খোপে নিজের নামলেখা তীর রেখে আসে। আর নিজের তূনের খোপে রাখে ইন্দ্রকুমারের তীর। ফলে ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার দিন যে ঘটনা ঘটার কথা ছিল তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। শুধউমাত্র হীন বুদ্ধির জোরে রাজধর ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষায় বিজয়ীর মালা প্রাপ্ত হয়। সেই সাথে সকলের সামনে রাজধর, মহারাজা অমরমানিক্যের হাত থেকে হীরে বাঁধানো তলোয়ার উপহার পায়।

রাজধরের ছলাকলা ইন্দ্রকুমার ধরতে পারলেও তা কারোকাছে বলতে পারে না। তাই এই পরাজয় সেমুখ বুজে মেনে নিয়ে বাধ্য হয়। সেই সাথে রাজধরকে আরো বড়ো পরীক্ষার সামনে উপস্থিত করার জন্য আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে যুধ করতে পাঠায়, আরাকনের রাজার সাথে সেনাপতি ইশাখাঁ, মধ্যমরাজ কুমার ইন্দ্রকুমার ও যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য প্রানপন যুদ্ধ করলেও ; রাজধর পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষে যখন সকলে বিশ্রামে রত ঠিক সেই সময় রাজবির কর্নফুলি নদী পার হয়ে আরাকান রাজের শিবির আক্রমন করে তাকে বন্দী করে রাজমুকুট

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ছিনিয়ে নেয়। সেই সাথে আরাকান রাজের কাছ থেকে সন্ধি প্রস্তাবের পত্র লিখিয়ে নেয়। অবশেষে রাজমুকুট নিয়ে নিজ শিবিরে প্রবেশ করে। এতে ইশাখাঁ রাজধরকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেয়। সেইসাথে রাজমুকুট যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের প্রাপ্য বলে মন্তব্যে সহমত পোষন করে। কিন্তু রাজধর বিজয়ীর মুকুট নিজেই পরবে বলে মত প্রকাশ করে। কারন রাজধর বুদ্ধির জোরে, হীন চক্রান্ত করে রাজধর রাজমুকুট ছিনিয়ে এনেছে। তাই রাজধরের কথাতে - "এমুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরষ্কার।" শেষ পর্যন্ত ইশাখাঁ রাজমুকুট কর্নফুলির নদর জলে নিক্ষেপ করে। সেই সাথে রাজধরের হীন চক্রান্তের জন্য তাকে শাস্তি যোগ্য বলে ঘোষনা করে। অপমানিত হয়ে কনিষ্ট রাজকুমার রাজধর আবার কৌশল অবলম্বন করে, নিজের দাদা যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য, মধ্যমরাজকুমার ইন্দ্রকুমার ও সেনাপতি ইশাখাঁ কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোপনে আরাকান রাজের কাছে পত্রপ্রেরণ করে। আরাকান রাজকে আক্রমন করার অনুরোধ করে। কারন রাজধর, ধুরন্ধরের হাত দিয়ে যে পত্র প্রেরন করেন তার মুল বক্তব্য বিষয় হল - "আমি অপমানিত হয়েছি, এই জন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব। ইন্দ্রকুমার ও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে, সৈন্যরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এই অবকাশে যদি আরাকান রাজসহসা আক্রমন করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।" রাজধর একবার কাপুরুষতা অবলম্বন করে হীনভাবে আরাকান রাজার কাছ থেকে যুদ্ধ জয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনে। আর একবার নিজের ভাইদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়। যুদ্ধে সেনাপতি ইশাখাঁর মৃত্যু ঘটে। যুবরাজ যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। আর ইন্দ্রকুমার নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাদা চন্দ্রমানিক্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ল ঠিক সেই সময় রাজধর সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে বলে -

"আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।"

কিন্তু যুবরাজের মৃত্যুঘন্টা বেঝে গেছে তাই যুবরাজ রাজধরকে আদেশ দেয় মুকুট মথ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারকে দেওয়ার জন্য। আর ইন্দ্রকুমার দাদা প্রতি অবিচল ভক্তি সহকারে বলে - "আমি পরাজিত এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম। - দাদ।"

অতএব দেখা যায় যে হীন চক্রান্ত করে রাজধর একাধিক বার বিদায়ীর মুকুট ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু তা কখনই বীরের কাজ হয় না। রাজধর্মের বিপরীতে গিয়ে রাজধর যে

কাজ করেছ, তা একমাত্র কাপুরুষদের পক্ষে মানন সই। আর যুবরাজ রাজধর্ম পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে। তাই যুদ্ধজয়ের রাজমুকুট একমাত্র প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের যা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের পরিনতিতে দেখিয়েছেন। রাজধর তার ভুল বুঝতে পেরে, যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দেখিয়েছেনরাজধর তার ভূলো বুঝতে পেরে, যুবরাজ চন্দ্রমানিক্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক 'রাজমুকুট' ফিরিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুপথ যাত্রী চন্দ্রমানিক্য সকলকে ক্ষমা পূর্বক রাজধরের দেওয়া মুকুট মধ্যম রাজকুমার যুবরাজের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে, যুবরাজকে শেষ সম্মান প্রদান করেছে। এভাবে 'মুকুট' নাটকের নামকরন সার্থক হয়েছে।

টিপ্পনী

চরিত্র চিত্রন

স্ত্রীচরিত্র বর্জিত নাটক মুকুট। মুকুট নাটকের সক্রিয় চরিত্র সর্বসাকুল্যে চারজন। যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য, মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্দরকুমার, কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর এবং সেনাপতি ইশা খাঁ। এছাড়া ধুরন্ধর, আরাকান রাজ, পরতাপ, নিশানধারী, ভাট, দূত ও সৌনিক চরিত্র আছে বটে তবে নাটকে খুব একটা গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা গ্রহন করে নি। এছাড়া ত্রিপরার মহারাজা অমরমানিক্য নাটকে একবার মাত্র উপস্থিত হয়েছে। কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরকে 'হীএ বাঁধানো তলোয়ার উপহার দিয়ে সেই যে বিদায় নিলেন সমগ্র নাটকে আর তার কোন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। সেকারনে নাটকের গুরুত্বপূর্ন চরিত্ররূপে উপরিউক্ত তিনজন আলোচিত হবে।

(ক) যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য

ত্রিপুরার ভাবী যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য। মহারাজ অমর মানিক্যের যোগ্য উত্তরসূরী। যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী, রাজা চন্দ্রমানিক্য ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির ব্যাক্তিত্ব। রাজা হওয়ার সমস্ত গুন তার মধ্যে বর্তমান। কর্তব্য ও কর্মে অবিচল রাজা চন্দ্র মানিক্য যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কখনো ভোলেন না। আবার পরের কথায় প্ররোচিত না হয়ে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ধারন করে থাকেন। ইশা খাঁ কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরেরর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করলে চন্দ্রমানিক্য ইশাখাঁকে সতর্ক করে দেয়। আবার রাজধর ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা দেওয়া কথা বললে ইশা খাঁ যখন উৎসাহিত হয়ে ইন্দ্রকুমার ও চন্দ্রমানিক্যকে সাবাশ বলে উৎসাহ দেয়। তখন চন্দ্রমানিক্য ইশাখাঁকে সতর্ক করে দেয়। রাজধর সেনাপতি ও ইশা খাঁর উপর রাগ করলে যুবরাজ বলে - "রাগ কোরো না ভাই রজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভৎসনা ওঁর সাআ দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে।

টিপ্পনী

কোনো একটি গুন দেখলেই তৎক্ষনাৎ উনিসবভুলে যান। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তোমায় জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।"

আবার অস্ত্র পরীক্ষা ভূমিতে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রকুমার যখন যুবরাজকে বলে - "দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে নইলে চলবে না।" তখন চন্দ্রমানিক্য বিচক্ষন ব্যাক্তির মতো উত্তর দেয় - "চলবে না তো কী ! আমার তীরটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও জগৎ সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে ল আর, যদি বা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

রাজধর তীর নিক্ষেপ করার পর যুবরাজ বিচক্ষন ব্যাক্তির মতো উত্তর করে - "না রাজধর তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে - লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।" তীর ছোঁড়ার পর যুবরাজের নিজের মনোভাব - "মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব ; তীরযোগ করতেই পারলুম না।" অর্থাৎ কৃতকর্মকে দায় স্বীকার করতে তিনি কখনো কুন্ঠা বোধ করেন না।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যখন অন্যায় ভাবে রাজধর হীন চক্রান্ত করে আরাকান রাজার কাছ থেকে মুকুট নিয়ে এসেছে। সেই মুকুট ইন্দ্রকুমার ও সেনাপতি ইশা খাঁ যুবরাজের প্রাপ্য বললেও যুবরাজ তা নিতে অস্বীকার করে। আবার দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যে আরাকান রাজ হঠাৎ আক্রমন করলে, বিচক্ষন ব্যাক্তির মত যুবরাজ তার মোকাবিলা করতে থাকে। সেনাপতি ইশা খাঁ যুবরাজকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে বললে, যুবরাজ ইশাখাঁকে বলে - "তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।"

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু মুখকে পাতিত হয়ে সেনাপতি ইশা খাঁর কাছে যুবরাজ কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আর ইশাখাঁ যুবরাজকে আশীর্বাদ করে বলছে - "বাবা জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনোদিনকোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ - আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখনি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।"

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মৃত্যু মুখে পতিত যুবরাজ চন্দ্রমানিক্য শুধুমাত্র অভিমানাহত ইন্দ্রকুমারের পথ চেয়ে বেঁচে আছেন। ইন্দ্রকুমার ফিরে আসলে যুবরাজ বলেন "আঃ বাঁচলুম ভাই ! তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বেঁচে ছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু অনেক রাত হয়েগেছে

ভাই, এবার তবে ঘুমোই, মা কোল পেতেছেন।"

মৃত্যুদূত শিয়রে জেনেও বিশ্বাস ঘাতক কনিষ্ঠ ভাই রাজধর কে ও ক্ষমা করে গেছে। যে রাজধরের জন্য ত্রিপুরার সৈন্যদের এই করুন পরিনতি। যার বিশ্বাসঘাতকতায় সেনাপতি ইশা খাঁর মৃত্যু, নিজেদের এই [রাজয়। সেই রাজধরকেও মৃত্যুকালে কাছে ডেকে ক্ষমা করে দিয়েছে। ভাই বলে তাকে সম্বোধন করে বিদায় নিয়েছে। আর রাজধরের বক্তব্য - "আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।" এভাবেই মুকুট নাটকের প্রধানচরিতএ তথা নায়ক চরিত্র হয়ে উঠেছে চন্দ্রমানিক্য। তবে তাঁর মহান কীতিত্বের জন্য তিনি আমাদের কাছে ট্র্যাজিক নায়কের শিরপা পেয়েছেন। সেইসাথে নাটককে শিল্প সার্থকতা মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

(খ) মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার

ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্যের মধ্যম পুত্র ইন্দ্রকুমার। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, বিচক্ষন, হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ছোটভাই রাজধরকে কখনই সহ্য করতে পারতেন না। ইশা খাঁ রাজধরকে অপমানিত করলে ইন্দ্রকুমার ইশাখাঁর সাথে যোগ দেয়। আবার যুবরাজকে শিকারে যাওয়ার কথা রাজধর বললে, ইন্দ্রকুমার প্রতিবাদ করে যুবরাজকে সচেতন করে দেয়। ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে রাধর তাঁর ও দাদার অস্ত্রশালায় প্রবেশ করলেও ইন্দ্রকলুমার রাজধরের সেই আচরনকে গুরুত্ব দেয় নি ল ফলস্বরূপ নিজের জয়কে রাজধরের হাতে সমর্পন করতে বাধ্য হন ল মুখবুজে সেই অপরাধ হজম করতে হয়েছে। আর মহারাজার কাছে ইন্দ্রকুমার বলেছে - "(মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা অপরাধ মার্জনা করুন ।আজ সকল রকমেই আমার হঘার হয়েছে।"

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা ইন্দ্রকুমার, যুবরাজের পাশে থেকে ছে। যুদ্ধের সকল খবর সে যথাসময়ে যুবরাজকে প্রেরণ করেছে। শত্রু সৈন্য হীনবল হয়ে পড়লে তা যুবরাজকে জানিয়েছে। আবার রাজধর কাপুরুষের মতো আরাকান রাজাকে বন্দী করে তার মুকুট নিয়ে আসলে তীব্র ক্ষোভে ও ইন্দ্রকুমার, রাজধর কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়েছে। সেই সাথে রাজধরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যুবরাজকে অনুরোধ করেছে। আর ক্ষিপ্ত হয়ে রাজধরকে বলেছে - "রাজধর তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছে।" আবার যুবরাজ রাজধরকে শাস্তি না দিলে ইন্দ্রকুমার অপমানিত হয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যুবরাজকে বলেছে - "(রুদ্ধকণ্ঠ) রাজধর ক্ষত্রিয়ধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ

টিপ্পনী

থেকে আজ পুরস্কার পেলে, আর আমি যে প্রানকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসা কধাও শুনতে পেলুম না ।" ..... ইন্দ্রকুমার যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান! (প্রস্থান)"

টিপ্পনী

তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যে ইন্দ্রকুমার নিজের কৃতকর্মের জন্য যুবরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। সেখানে মৃত্যুপথ যাতরী যুবরাজকে ইন্দ্রকুমার বলেছে - "পরাজয় তোমার হয় নি দাদা, আমারই পরাজয় পরাজয় হয়েছে।" শেষ বিদায়ের কালে রাজধরের দেওয়া মুকুট যুবরাজকে ফেরৎ দিয়ে বলেছে - "আমি পরাজিত, এ মুকুট আমার নয়। আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম ; দাদা।" এভাবেই ইন্দ্রকুমার নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছে। আবার মহানুভবতার জন্য দাদা যুবরাজ চন্দ্র মানিক্যের কাছে অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে তার পায়ে অর্পন করেছে। দাদা প্রতি অচল ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেকে ধন্য করেছে।

(গ) কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর

রাজা অমরমানিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর। ইনি হীন চক্রান্তকারী নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পারে না এমন কাজ হয় তো এর কাড়ে নেই। নিজেকে জাহির করার জন্য চক্রাআন্ত করে ধুরন্ধরের সহায়তায় অস্ত্রবদল করেছে ল নিজের অক্ষমতা ঢাকা দেওয়ার জন্য ভাইদের অপমান করেছে। যুবরাজ তার ছোঁড়া তীর নিদিষ্ঠ লক্ষভেদ করেনি বললে, রাজধর যুবরাজকে বলেছে - "আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেইউ বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমান হবে।"

এই রাজধর আবার অস্ত্র পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে ধুরন্ধরকে বলেছে - " ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনো রকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার - দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূনের প্রথম খোপটি থেকে তগাঁর নাম লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমায় নেম লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।" এভাবে কৌশল করে রাজধর নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে সচেষ্ট।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজধর আরাকান রাজের সাথে যুদ্ধ না করে কৌশল করে আরাকান রাজকে বন্দি করেছে। সেই সাথে আরাকান রাজকে বলেছে - "মহারাজের মাথায় মুকুট আমাকে দিতে হবে।" করেছে ও তাই এই সংবভাদ পেয়ে সেনাপতি ইশা খাঁ রাজধরের উদ্দেশ্যে যুবরাজকে বলেছে - "সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে

শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন - আর, উনি পারবেন মুকুট ! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।" তবু রাজধরকে উদ্দেশ্য করে যুবরাজ বলেছে - "ভাই তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিবে দিচ্ছি।" ইন্দ্রকুমার ও সেনাপতি ইশা খাঁ রাজধরকে মানতে পারে না। ইন্দ্রকুমার রাগ করে যুবরাজকে ত্যাগকরে চলে গেছে। ইশা খাঁ কর্নফুলি নদীতে 'মুকুট' বিসর্জন দিলে রাজধর অপমানিত বোধ করেছে, এবং এর ফল ভালো হবে না দাদা যুবরাজকে সতর্ক করেছে। সেই সাথে গোপনে আরাকান রাজার কাছে পত্র প্রেরন করে আক্রমন করতে অনুরোধ করেছে। ফলে যা ঘটবার তা অবসম্ভাবী ভাবে ঘটেছে। যুদ্ধে সেনাপতি ইশা খাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ওযুবরাজ চন্দ্রমানিক্যে মৃত্যু শয্যায় অপেক্ষা করেছে। শেষ পর্যন্ত রাজধর নিজের ভুল বুঝতে পেরে যুবরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আর যুবরাজ, রাজধরকে ক্ষমা করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

রাজধর যদি সঠিক ভাবে চলত তবে ত্রিপুরার সৈনভদের আজ এই হীনতার অবস্থা ঘটত না। অকালে তাদের মরতে হতো না। রাজধরের যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি সঠিকভাবে বভবহার না করে হীনদাত বৃত্তি অবলম্বন করেছে ল তাই রাজধরে যতই বুদ্দধি ও কৌশল থাকুক না কেন তিনি আমাদেদর কাছে কোন করুনা পাওয়ার যোগ্য নন ল তিনি শুধু হীন, চক্রান্ত কারী, ভিলেন হিসেবে নাটকে থেকে যান যা নাটকের শিল্প সফলতার ক্ষেত্রে অবশম্ভাবী ছিল।

ঋনস্বীকার

মুকুট - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড) বিশ্বভারতী, ড. আচার্য জগদীশ বসু রোড়, কলিকাতা - ১৭।

সাম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) 'মুকুট' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(২) মুকুট নাটকের নামকরনের সার্থকতা আলোচনা করো।

(৩) মুকুট নাটককে কি ট্রাজেডি নাটক বলা যায়? তোমার অভিমত ব্যাখ্যা কর।

(৪) মুকুট নাটকের নায়ক কে? তার চরিত্র বিশ্লেষন কর।

(৫) চন্দ্রমানিক্য চরিত্রের সার্থকতা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৬) মুকুট নাটকে ইন্দ্রকুমারের গুরুত্ব কতখানি বলে তুমি মনে করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(৭) রাজধর কে কি আমরা নাটকের অতি সক্রিয় চরিতর বলতে পারি?

(৮) নাটকের ঘটনা ধারার সাথে প্রায় সব অংশে রাজধর জড়িত, তবু তিনি নাটকের নায়ক নন কেন?

(৯) ভিলেন চরিত্র রূপে রাজধরের মূলয়্যায়ন কর?

(১০) নাটকের ঘটনা ধারার সাথে রাজধরের ক্রিয়া কলাপ কি সঙ্গতি পূনর্ন বলে তুমি মনে করো।

দ্বিতীয় একক হ য ব র ল (সুকুমার রায়)

টিপ্পনী

সুকুমার রায়ের সময় ও হযরল

রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখক গোষ্ঠীর মধে সুকুমার রায় (১৮৮৭ -১৯২৩) অন্যতম সাহিত্যিক ব্যাক্তিত্ব। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র সুকুমার রায় সাহিতের উপযুক্ত গলিরাস্তাটি চিনে নিয়েছিললেন। চিনে নিয়েছিলেন সমাজের প্রান্তকায়িত মানুষজনকে। জেনেছিলেন মানুষের অন্তনিহিত ভাবসত্যকে। দার্শনিক সুলভ নোইভাব নিয়ে তিনি সাহিত্যের আকাশে নিজের পথটি প্রশস্ত করে নেন। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলি নিয়ে লেখক বা সাহত্যেকরা তাদের সাহিত্যের কাহিনী ফায়ার নির্মিত দেন। সুকুমার রায় ও তার বাতিক্রমীনন।

উপে্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশু মনের অলিতে গলিতে হাঁটার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'টুনটুনির' গল্প বইটিতে 'দাঁত না ওঠা' দুধে শিশুদের মকনের খোরাক যুগিএছে। সুকুমার রায় তার থেকে আর একধাপ এগিয়ে 'দাঁত ভাঙা' শিশুদের মনের চোরা গলিপথ তুলেধরার চেষ্টা করেছেন। তার রচনা গুলি উদ্ভট, আজগুবি গল্প মালায় পরিপূর্ন। যা শিশু মনের কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে' গল্প গরন্থে দাদু নাতীর আসরে নাতনীকে তৃপ্ত করার জন্য উদ্ভট কল্পনায় সংমিশ্রনে নাতনীকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেখানে পুচু কখনো কখনো দাদুর পরিপূরক হয়ে ধরা দেয়। কল্পনার রঙে জারিত হয়ে শিশু মনকে অনেক দূরদেশে পাড়ি জমাতে সাহায্য করে। সুকুমার রায়ও তার গল্পে সেই উদ্ভট রসের অবতারনা করেন। 'হ-য-ব-র-ল' সেই উদ্ভট আজগুবি রসের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা - প্রথম গল্প

'হ -য -ব - র-ল' একটি গল্প মালা। জাতক, কথাসারিৎ সাগর থেকে চলে আসা রূপকথাধর্মী গল্প বলার ধরনের অনুকরন কায়ী গল্পমালালা। 'হ - য- ব- র - ল' যেন একটি গল্প বলার আসর। গল্পের চরিতররা প্রতেকেই স্বাধীন ল কেউ কারো মুখাপেক্ষী নয়। চরিতররা যেন রঙ্গমঞ্চে এক এক করে প্রবেশ করে তাদের কথা গুলি সবাধীন ভাবে জানিয়ে যাচ্ছে। তবে গল্পগুলি একে অপরের সাথে সাযুজ্য পূর্ণ। সেই সাথে গল্পের স্বাদ সাহিত্যে আক ভিন্ন মাত্রা

সংযোগ করেছে। গল্প বলার গল্প, এবং তার ভিতরে আবার গল্পের আসর সবই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখকের বাচনিক তৎপরতায়।

টিপ্পনী

গল্পগুলো কেমন যে অদ্ভুত ধরের। গল্পের বক্তা স্বপ্নদৃষ্টি এক বালক। যার বয়স আট বছর তিন মাস। বেজায় গরমে গায়ের ঘাম মুছে রুমালটা সে পাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। গাছের শীতল ছায়া সেই সাথে গ্রীষ্মের বাতাস অনেকটা সস্তি ও শান্তির প্রলেপ দিছে। আধঘুমো অবস্থায় পরক্ষনে যেই রুমালটা তুলতে গেছে , অমনি রুমালটা "ম্যাও" করে ড়েকে উঠলো। সেই সাথে বেড়ালটা "গোঁফ ফুলয়ে প্যাট প্যাট" করে বালকের দিকে তাকিয়ে আছে। রুমালটা কিভাবে বেড়াল হয়ে গেল সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই বেড়াল যুক্তি দেখাল - 'ডিম' যদি একটা "প্যাঁকপ্যাঁকে" হাঁস হতে পারে, তে রুমাল কেন বেড়াল হতে পারে না। অকাট্য যুকতি যা খন্ডন করা সম্ভব নয়। তবে গোল বাঁধে 'রুমাল না বেড়াল' কি নামে ডাকা হয়ে এই নিয়ে। বেড়ালের যুক্তি "বেড়াল বলতে পারো, রুমাল ও বলতে পারো, চন্দ্রবিন্দুও বললতে পারো।" "চন্দ্রবিন্দু কেন?" জিজ্ঞাসা করতেই বেড়ালটা বালকের অজ্ঞাতা দেখে একচোখে বুজে 'ফ্যাচফ্যাচ' করে আসতে লাগল। বালক কিছুটা থতমত খেয়ে না বুঝে বোঝার ভান করে বললো বুঝতে পেরেছি। বেড়াল বেজায় খুশি হয়ে বললো, বোঝাই যাচ্ছে - "চন্দ্রবিন্দুর - চ, এড়ালেরতালবশ্য, রুমালের - মাহল চশমা।" মাথা মুন্ডুহীন যুক্তিতর্কে পটু বেড়ালের সাথে পেরে ওঠা দায়। না বুঝে বোঝার ভান করা। এবং মাথা নেড়ে সম্মতি জানানো সবই সুকৌশলো সুকুমার রায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। কারন শিশু মন যুক্তিতর্ক বোঝে না। কথার জালসে বুনতে ভালো বাসে, কল্পনার রঙে ভেসে যেতে চায়। কাহিনীর গতিকে তরান্বিত করার জন্য গল্পের পট পরিবর্তন ঘটায়। ফলে বোঝাবুঝির এই পাট চুকিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য হঠাৎ বেড়াল বলে বসে "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো।" সেই সাথে তিব্বত যাওয়ার একটা সোজাসাপ্টা রাস্তাও বাতলে দেয় বেড়াল। "কলকেতা, ডায়মন্ড হারবার, রানাঘাট, তিব্বত বাস। সিধে রাস্তা সওয়া ঘন্টার পথ।" সেই সাথে গেছোদাদার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কারন এছোদাদা প্রায়শই তিব্বত যাতাযাত করে। তবে গেছেদাদার সাথে দেখা করাও সহজ কাজ নয়। কারন তিনি একটা নিদিষ্ট জায়গায় বেশী ক্ষন থাকেন না। যদি তার সাথে দেখা করার জন্য উলুবেড়ে যাও তখন তিনি থাকবেন মতিহারি ল মতিহারি এলে গেছোদাদা থাকবেন রামকেষ্টপুর, আর রামকেষ্টপুর গেলে গেছোদাদা থাকবেন কাশিম বাজার। এহেন গেছোদাদার সাথে দেখা করার উপায়ও বাতলাতে সময় লাগে না বেড়ালের। বেড়ালের মতানুযায়ী - "আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় নেই, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদ এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হে, সেই হেসেবমতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে -" এই

"তারপরের" অবশেষ নেই, থাকতে পারেও না। তাই গেছোদাদা, - তুমি চন্দ্রবিন্দু - তিব্বত-গেছোবউদি, শেষপর্যন্ত গাছের গায়ে "একটু ফুটো"। যে ফুটো দিয়ে গল্প কথক বেড়াল যেন পলান করতে চায়। কাহিনীতে ও বেড়ালের অকস্মাৎ পলায়ন যেন নাটকের যবনিকা পতন ঘটে।

টিপ্পনী

বিষয় বস্তু পর্যালোচনা দ্বিতীয় গল্প

দ্বিতীয় গল্পে কাকের প্রবেশ। সে আআর যে সে কাক নয়। রীতিমতো অঙ্ককষা পন্ডিত এই কাক। শ্লেট - পেনসিল পুস্তক সমন্বিত বই কাক রীতিমতো প্রশ্ন করতে থাকে। "সাত দু'গুনে কত হয়?" বালক সুকুমার প্রথমে হক্‌চকিয়ে গেলেও পরক্ষনেই কাকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে। তবে তাতে কাক সন্তুষ্ট হতে পারে কনা। সাত দুগুনে যদি চোদ্দো হয় না। কারন সময়ের সাথে সাথে অঙ্কের ও পরিবর্তন ঘটে। "সাত দুগুনে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিলল"- সত্যি তো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জমিদার বঙ্গ দেশের কৃষক' - প্রবন্ধে জমিদারের নায়েব গোমস্তরা কৃষকদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য আতে পেনসিল রাখতেন। পেনসিলের জন্য খোঁচায় কৃষকদের সর্বশান্ত করতেন তারা। সেই সমাজ সচেতন তারই প্রতিচ্ছবি যেন এই গল্প। হঙাৎ করে গল্পে প্রবেশ করে দেড় হাত লম্বা, টাক মাথা এক বুড়ো। যার দাড়ি পা পর্যন্ত লম্বা। হাতে কলকে হীন হুঁকো। সবুজরঙের দাড়ি। টাকের উপর খড়ি দিয়ে লেখনির ছাপ স্পষ্ট।

বুড়ো কাকের কাছে হিসেব আয়। কাক উনিশ দিনেও বুড়োর হিসেব ঠিকঠাক মতো দিতে পারে না। তবু অঙ্কের একটা মানান সই উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে বুড়ো। অঙ্কের সমাধান সূত্র জিহ্বায় রেখে কাক বালককে মাপতে শুরু কে। বুড়োর মাপ অনুযায়ী "খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।" অর্থাৎ সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়। কারন বুড়োর ফিতেয় শুধুমাত্র ২৬ লেখাটাই পড়া যাচ্ছে আর সব অস্পষ্ট হয়ে আছে। ফলে ২৬ ছাড়া বুড়ো আর কিছু মনে আনতে পারে না। বহুদিনের শেখানো অভ্যাস বুড়ো ভুলতে পারে না। তোতা পাখির মতো পুরানো শেখানো বুলি আউড়ে যায়। সেখানে সবই ছাব্বিশ হয়ে ধরা দেয়। আর ওজন হয় - "আড়াই সের, বয়স সাইত্রিশ।" আমি বললাম "ধুত ! আমার বয়স আটবছর তিন মাস, বলে কিনা সাইত্রিশ।" - স্পষ্টতই বোঝা যায় বুড়ো বাঁধা ধরা এই ছক থেকে বেরতে পারে না। সবই তার কাছে দৃষ্টি ভঙ্গি বা বাস্তবতার সাথে যায় মিল বা সত্যতা যাচাই করতে যাওয়া হয় তো ভুল হবে। কারণ সুকুমার রায় শিশু মনের খোরাক যোগাতে তৎপর, সেখানে কল্পনা বা আজগুবিই প্রাধান্য পায়। বাস্তব সত্য সেখানে প্রাধান্য না পাওয়ারই কথা। কারন শিশুমন যুক্তিতর্ক এড়িয়ে রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়। বুড়ো ও সেই সুযোগে - "রাজকন্যার

টিপ্পনী

গুলিসুতো" খেয়ে ফেলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভয়ানক রসের অবতারনা করেন। সেই সাথে কাক যে একজন "জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ" তাও সুকৌশলে জানিয়ে দেয়। বিজ্ঞাপন লেখা "হ্যান্ডবিল" বিতরন করে। তাতে লেখা আছে - "শ্রী শ্রী ভূশন্তিকাগায় নম: শ্রী কাক্কেশ্বর কুচকুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয় পটি আমরা ইসাবি ও বেহাসাবি খুচরা ও পাইকারি সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১/০। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্থমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরন পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। সাবধান !! সাবধান !! সাবধান !!" সেই সাথে নিজ বংশ পরিচয় উত্থাপন করে। অন্যান্য নীচু শ্রেনীর অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে খরিদ্দার গনকে সাবধান করতে ও ভোলেন না। কাক যে একজন সুকৌশলে ব্যবসায়ী তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। ব্যবসায়ী কাকের সাথে বুড়ো যুক্তি তর্কে পেরে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত উধো ও বুধোর প্রবেশ ঘটে গল্পে। দু' জনের লড়াই এবং আপসে মিমাংসার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়বস্ত পর্যালোচনা তৃতীয়গল্প

পট পরিবর্তনের জন্য গল্পে প্রবেশ ঘটে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ এর - "মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না - খালি হাত পা ছুড়ে হাসছে, আর বলছে, এই গেল গেল - নাড়ি ভূঁড়ি সব কেটে গেল।" অদ্ভুত যন্ত এটি। তার হাসার কারণ ও অদ্ভুত ধরনের। সবই কল্পনায় উপপর নির্ভর করেই তার হাসির ফোয়ারা। হাসির কারন জিজ্ঞাসা করতেই যন্তটা পরপর তিনটি গল্প বলল। প্রথম গল্প - "মকনে করো, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল যদি গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙ্গার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচপ্যাচ কাদা হয়ে যেত, আর লোক গুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে - হোঃ হোঃ হোঃ -"

দ্বিতীয় গল্পে - এক জন লোক "কুলফিবরফ' খেতে গিয়ে ভুল কমরে "সাজমাটি" খেয়ে ফেললো বলে হাসি।

তৃতীয় গল্পে - "একজন লোক টিকটিকি পোষ, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকতো দেয়, একদিন একটা রাম ছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে - হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ -" - স্পষ্টতই হাসির নিদির্ষ্ট কোন কারন নেই। সবই অনুমান ও কল্পনা নির্ভব। অদ্ভুত ধরনের জীব এই হিজ বিজ্‌ বিজ্‌। তাদের বাড়ির সকলের নাম একই। তার ভাইয়ের নাম, বাবার নাম, পিসির নাম অর্থাৎ সকলের নাম হিজ বিজ্‌ বিজ্‌। পরে আবার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় - 'তকাই'। খুড়ো, মামা, মেসো, শ্বশুর সকলের নাম হয়, 'তকাই'। আবার ধমক খাওয়ার পর

শ্বশুরের নাম হয়ে যায় 'বিস্কুট'। অর্থাৎ খামখেয়ালি পনা চলন সই একটা ঠিক করে নিলেই সেটা প্রতিষ্ঠা পায় শিশু মনে। কারণ শিশু মন যাচাই করে সত্যতা প্রমাণে রত হয় না। সবই শিশুর কাছে নতুন বলে মনে হয়। যা আনন্দ দান করে তা তার কাছে নতুনের স্বাদ দেয়।

টিপ্পনী

হিজ বিজ্ বিজের প্রসঙ্গ টেনে গল্পে প্রবেশ করে 'মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল'। সেই সাথে ছাগল তার খাওয়া ও না খাওয়ার একটা তালিকা দেয়। সেই তালিকায় বেশ চমকপ্রদ। ছাগল রাজনীতির নেতাদের মতো সভাতে বক্তৃতা দেয়। যার বিষয় - "ছাগলে কিনা খায়।" বক্তৃতায় ছাগল জানায় তার নাম - শ্রীব্যাকরণ শিং বি. এ খাদ্যবিশরদ।" ছাগল আরো জানায় যে, সে চমৎকার "ব্যা" করতে পারে, তাই তার নাম "ব্যাকরণ"। ইংরেজিতে "B.A" অর্থাৎ "ব্যা"।

কথাপ্রসঙ্গে হিজ বিজ্ বিজ্ বলেছিল যে রামছাগল "টিকটিকি খায়" ব্যাকরণ শিং এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সেই সাথে ছাগল তার খাদ্য তালিকা দেয়। সেখানে ছাগল জানায় যে সে মাঝে মাঝে খকাবারে ঠোঙা, নাকেলের ছোবড়া, খবরের কাগজ, সন্দেশ, পত্রিকাখায়। তবে ভালো বাঁধানো মজবুত বই তারা খায় না। কখনো কখনো লেপ বালিশ, কম্বল, তোশক ইত্যাদি খেয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে খাট, পালং, টেবিল, চেয়ার ছাগল খায় না। আআর পেনসিল, রবার, বোতলের ছিপি, শুকনো জুতো বা ক্যাম্বিসের ব্যাগ কখনো কখনো ছাগল চেখে দেখে। কোন কোন ছাগল আবার সাবান খেতে ভালোবাসে। তবে তা নেহাৎ ই 'বার-সোপ'। এই সাবান খেয়ে যে ছাগলের ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে ছিল, তা ছাগলের কথাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য গল্পে গানওয়ালা ন্যাড়ার প্রবেশ ঘটে। সে উপযাচক হয়ে সকলকে গান শুনাতে চায়। গানের ভাষা ও অদ্ভুত ধরনের। গানের ভাষায় শিশি, বোতল, থেকে শুরু করে বাদুড়, প্যাঁচা, কুমির, ব্যাঙ, ইঁদুর, ব্যাঙাচি, শজারু প্রভৃতি জন্তুদের ক্রিয়া কলাপ ফুটে উঠেছে। গান শেষে কোলাব্যাঙ চিৎকার করে "মানহানির মোকদ্দমা" করার কথা বলে। কারণ গানের ভাষাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন সংশয়ের কথা বলা হয়। শজারু কাঁদতে থাকে, কুমীর তাকে শান্তনা দেয়। কোলাব্যাঙ মানহানির কথা বলে। প্যাঁচা হাকিম হয়ে বসে নালিশ বাতলাতে বলে। কুমির চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ ছয় ফোটা জল বের করে বলা হুজুর এটা "মান হানির মোকদ্দমা'। সেই সূত্রে কুমির 'মান' কথার তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে - মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু প্রভৃতির কথা। কচুর আসার তত্ত্ব বোঝাতে শেয়াল মাঠে নেমে পড়ে। সেই সাথে শেয়াল বলে "কচুখায় শুয়োর আর শজারু। ওয়াক থুঃ।" শজারু সাক্ষী যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। বাদুড়

টিপ্পনী

গোপালকে সাক্ষী বানানো হলেও সে ভয়ে সাক্ষী দিতে হাজির হয় না। শেষ পর্যন্ত চার আনা পয়সার লোভ দেখিয়ে হিজবিজ্‌বিজ্‌কে সাক্ষী মানোনো হয় । উকিল, সাক্ষী হিজবিজ্‌বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করে যে, সে আসামীকে চেনে কিনা। অমনি হিজবিজ্‌বিজ্‌ শোনা কথা বলতে থাকে - "সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে ননীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ- হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ -"

হিজিবিজবিজ্‌ শজারুকে চেনেকিনা জিজ্ঞাসা করতে হিজবিজবিজ বলে "হ্যাঁ শজারু চিনি, কুমির চিনি, স চিনি। শজারু গর্তে থাকে তার আয়ে লম্বা -লম্বা কাঁটা, আর কুমীরের গায়ে চাকা চাকা ঢিপির মতো , তারা চাগল টাগল ধরে খায়।" মোকদ্দমা বিষয়ে হিজবিজবিজ কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে হিজবিজবিজ বলে - "তা আর জানি নে ? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী তারও একজন উকিল থাকে। এক একদিন দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়।" সমাজ সচেতন সুকুমার, সমাজের বাস্তবচিত্রই যেন এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেচেন এই নিম্নতর জন্তু জানোয়ারে রেখা চিত্র । উচ্চতর সম্প্রদায়ের মানুষজন টাকার বিনিময়ে নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, যেমনভাবে তাদের আসামী বানানো হয়। সেই দৃষ্টান্ত এখানেও বর্তমান। আসাম থেকে আনলেই তাকে আসামী করা হবে, আবার কোর্টের যিনি জজ তিনি বসে বসে প্যাঁচার মতো ঘুমতে থাকে। সত্যকথা বললে, তিনি যেমন নানা ধরনের অজুহাত খোঁজেন। প্যাঁচা ও তেমনি অজুহাত খুঁজতে থাকে। প্যাঁচার ঘুমনোর কথা বলতে প্যাঁচা প্রতিবাদ করে জানায় তার চোখের ব্যারাম আছে বলে সে চোখ বুজে আছে। অমনি হিজিবিজবিজ লে - "আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।" বলে সে হেসে ফেলে কথা প্রসঙ্গে হিজিবিজবিজ জানায় একজনের মাথার ব্যারাম ছিল বলে সে প্রত্যেকটি জিনিসের নামকরন করতো । তার জুতোর নাম ছিল - "অবিমৃষ্যকারিতা", ছাতার নাম - "প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব", গাড়ুর নাম "পরমকল্যানবরেষু", বাড়ির নাম - "কিংকর্তব্যবিমূঢ়"। তবে হিজবিজবিজ ও সময়ের সাথে সাথে নাম পাল্টে ফেলে। সকালে নাম থাকে - "আলুনারকোল", বিকালে -"রামতাড়ু"। এখন 'হিজবিজবিজ'। শেআল একথা শোনার পর বলে "হুজুর এরা সব পাগল আর আহম্মক, এদের সাক্ষর কোন মূল্য নেই।" মূল্য নেই শুনেই কুমির রেগে গিয়ে বলে রীতি মতো পয়সা দিয়েই সাক্ষী যোগাড় করে এনেশি আর মূল্য নেই বললেই হল। বলেই সে হিজিবিজবিজ এর হাতে ষোলোটা পয়সা দিয়েদেয়। পয়সা পেয়ে হিজিবিজবিজ শেয়ালের গুনকীর্তন করার জন্য যেই গান ধরেচে, অমনি শেয়াল নিজের দোষ ধরা পড়েছে দেখে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য হিজিবিজবিজকে সাক্ষী দেওয়া থেকে বিরত করে।

সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে কাক ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষি দিতে শুরু করে। সে নিজের তাগিতে তার সমস্ত পরিচয় বলে যাচ্ছে। এই কাক গাছের ড়ালে বসে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা পুঙ্খনাপুঙ্খ ভাবে লিখে রেখেছে। ড়েয়াল তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে সমস্ত ঘটনা বলে চলে। সেই সাথে কাক জানায় - "একজন লোক ছিল সে সকলের নামকরন করত - শেয়ালকে বলত তেলচোরা, কুমিরকে বলত অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলত বিভীষন -" একথা শোনার পর বিচার সভাতে একটা ভয়ানক গোলমাল বেঁধে গেল। এই ফাঁকে কুমীর টপ করে "কোলাব্যাঙকে" খেয়ে ফেলে। সেই ঘটনা দেখে "ছুঁচো" কিচিমিচ্ করে চ্যাঁচাতে থাকে, আর শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে কাককে তাড়াতে থাকে। এদিকে প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বললো সবাই চুপ করো, আমি মামলার রায় ঘোষনা করবো। সেই সাথে খরগোশকে লিখতে বললো। ফরিয়াদি শজারু। তবে আসামীকে কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছেনা দেখে ন্যাড়াকে আসামী বানানো হল। আর বোকা ন্যাড়া ভাবলো আসামী হলে হয়তো পয়সা পাওয়া যায় এই লোভে সে চুপ করে থাকলো। প্যাঁচা রায় ঘোষনা করলো - "ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিন ফাঁসি।"

বালকক সুকুমার এই অন্যায় বিচারেদর বিরুদ্ধে আপোত্তি করার কথা ভাবছে, এমন সময় ছাগলটা তাকে একটা ঢুঁ মারল আর কান কামড়ে দিল। অমনি বালক সুকুমারের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল ছাগলটার মুখ বদলিয়ে তার মেজেমামা হয়ে গেছে। মামা কানক ধরে বকছে আর বলছে - "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে?"

রুমালটা কোথাও পাওয়া গেল না। একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে ছিল। সে বালককে দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় একটা ছাগল বাগানের পিছনের দিক থেকে 'ব্যা' করে ডেকে উঠল। বালক সুকুমার এসব কথা তার বড়মামার কাছে বলতে গিয়ে ছিল। কিন্তু বড়মামা না বিশ্বাস করে তাকে তাড়িয়ে দিল। আর বালক সুকুমারের অভিজ্ঞতা - "মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশী বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।" স্পষ্টতই গল্পের শেষ অংশ থেকে বোঝা যায় যে, যাদের বেশী বয়স হয়নি তাদের মন ভোলানোর জন্য এই 'হ য ব র ল" গল্পটি রচনা করা হয়েছে।

ননসেন্স এর হাতছানি

সন্দেশ পত্রিকায় ১৯২২ এর মে থেকে সেপ্টেম্বর "হ য ব র ল" প্রকাশিত হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষ হয়েছে। আমাজ ও সভ্যতায় উথাল পাতাল ঘটে গেছে। ১৯১৯ "জালিয়ানওয়ালা বাগ" দেশের মানুষের চরমতম বিপর্যয় নমানবিক মূল্যবোধের অবসান। সেই সাথে এক নবারকীয় হত্যাকান্ড দেশের মানুষের হতভম্ব করে দেয়। বন্ধু প্রশস্ত মহলানবিশকে লেখা ১৯২০ সালের 'একান্ত ব্যাক্তিগত' এক পত্রে সুকুমার জানাচ্ছেন যে তার বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে। চারিপাশ কুটিলায় ভরে গেছে। আনন্দ, অমৃত, ভূমার কোন চিহ্ন যেন নেই। বিশ শতকে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আপেক্ষিকতার 'বিশেষ' তত্ত্ব (১৯০৫) আর 'সার্বিক' তত্ত্ব (১৯১৬) মানুষের চেনা জগতের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে তৎপর মানুষের চেতনা বিশেষ ওলট পালট ঘটাতে সেষ্ট হয়। চেনা পরিস্থিতি পরিবর্তে অচেনা জগতের সাথে পরিচিতি ঘটাতে থাকে। অর্থাৎ কমন সেন্স এর পরিবর্তে যেন 'ননসেন্সের' হাতছানি সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। সুকুমার সেই 'ননসেন্সের' কারবারির প্রতিষ্টা ছিলেন তার সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স অর্থাৎ উদ্ভট রসের লেখক রবীন্দ্র নাথ ও সুকুমার রায় ছাড়া আর কেউ নেই বললে চলে। তবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে ও এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ননসেন্স রসের প্রকাশ পাই 'খাপছাড়া ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। সুকুমারের মৃত্যুর নয়দিন পর। রবীন্দ্রনাথের থেকে সুকুমার বয়সে ছোট হলেও তার ননসেন্স কবিতায় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের বারো - তেরো বছর আগে পাশহচাত্য সাহিত্যে লুইস ক্যারল ও এডওয়র্ড লিয়র ননসেন্স রসের উদ্যাগতা। যদিও অগডেন ন্যাশ, কলিউন ওয়েস্ট, স্পাইক মিলিগন প্রমুখের নাম ও এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল" অবশ্য লুইস ক্যারল ছাপ লক্ষনীয়, তবে তা শৈলীগত উপাদান গত ঠিক বলা যাবে না। সুকুমার তার যে জগৎ গড়ে তুললেছেন 'হ য ব র ল' তে তা অবশ্যই তার নুইজস্ব ও মৌলিক।

কাকে বলব 'ননসেন্স'? এককথায় বলতে গেলে বলব যার কোন সেন্স নেই। সেন্স শব্দটি এখানে যুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। চেতনা অর্থে নয়। ননসেন্স ভার্স অর্থাৎ উদ্ভট কবিতা আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় 'যুক্তিবিহীন পদ্য' বা রচনা - "রাইম উইদাউট রিজন।" কার্য কারণ সম্পর্ক হীন গতিধারাধই স্রষ্টা হিসাবে সুকুমার সাহিত্যে নিজস্ব পথটিকে আমাদেরকে চিনিয়ে দিলেন। তাঁর 'হ য ব র ল' শুরুতেই স্বীকৃত যুক্তি কাঠামোকে অর্থাৎ কমনসেন্সকে নসাৎ করে দিয়ে রুমাল বিড়াল হবে ধরে দেয়। বিড়াল তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে - "বেড়াল ও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো।" অর্থাৎ বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছু নিদিষ্ট নয়। বেড়াল - চন্দ্রবিন্দু- রুমাল বা চশমা - কোনটারই হিসাব ইআমাদের চেনা

পরিচিত যুক্তি কাঠামোয় আর মিলছে না। ব্যাকরণের কোন নিয়মে কিকি অক্ষর সমন্বয়ে 'চশমা' হয় তার সঠিক উত্তে পাওয়ার যুক্তি তর্ক স্বীকৃত পায় না। কারণ বেড়ালের সিস্টেম আর আমির সিস্টেম এক নয়।তাই এত দিনের নিদির্ষ্ট ধারনা ছিলল যে কোন একজন ব্যাক্তিকে একটি নিদির্স্ট স্থানে গেলে পাওয়া যাবে। কিন্তু বেড়ালের যুক্তিতে গেচোদদাকে মতিহারি খুঁজতে যাওয়া বোকামি। তিনি একটি নিদির্ষ্ট জায়গায় আটকে থাকে না। সবাই আপেক্ষিকতায় উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পরম সত্য বলে কিছু নেই। সবাই একটা সিস্টেমে সীমাবদ্ধতার মাত্রা মাত্র।

এই সীমাবদ্ধতার মাত্রাটি সমাজ বাস্তবতার নিরিখে দন্ডামান। কে এই ভাবে গেছোদাদা? বেজায় গরম নামক সমস্যার সমাধানে পথ সে বাতলাতে পারে। তবে তাকে পাকওয়া বা তার কাছে পৌঁছনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য ব্যাকুল হওয়া যায় কিন্তু তার কাছে পৌঁছানো যায় না। কারণ বর্তমান সমাজু যে "গভীর গভীরতর অসুখ।" এই অসুখ থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই গেছোদার কথা, তার গল্প তার সমস্যা সমাধানের পথ সবাই বাতলাতে পারে। একটা সিস্টেমের মধ্য থেকে কিন্তু পৌঁছনো সম্ভব নয়।

কাকের কথা অনুযাবী সাত দুগুনে চোদ্দ" সবসময় হয় না। সুকুমার এই উক্তি দবারা কোন তত্ত্ব আমাদের সামনবে উপস্থিত করতে চাইলেন। একটু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। কাল অন্যনির্ভর আপেক্ষিক একটা মাত্রা। তাই একটা নিদির্ষ্ট মূহূর্তে যেটা সত্য, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থাৎ পরমূহুর্তে অর্থাৎ কালের মাত্রা বদলের সাথে সাথে আর সেটা সত্য থাকতে পারে না, তাই কাকের কথায়-

"তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দো হয় নি। তখন ছিলো তেরোটাকা চোদ্দো আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম তা হলে এতক্ষনে হয়ে যেত চোদ্দো টাকা এক আনা নয় পাই।" - তাহলে আমাদের এতদিনকার পরমত্ব বিশ্বাসী যুক্তীর কি বদল ঘটবে। কারণ - "সাত দুগুনে যদি চোদ্দো হয়, তা যে সবসময়েই চোদ্দো। একঘন্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।" এই দুই যুক্তি কাঠামোয় বিরোধ লাগাটাই স্বাভাবিক।

অর্থাৎ 'হ য ব র ল' রচয়িতার প্রধান বৈশিষ্ট্য একটা স্তর অবধি সেন্স জাত যুক্তি কাঠামোর অপ্রতুলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। জটিল বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ভাবনাকে আশ্চর্য মজার মোড়কে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, শিশু মনস্তত্ত্বের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নিরিখে। সুকুমারের বৈজ্ঞানিক ভাবনা জাত উপলব্ধি আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। যে সেন্স জাত ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যুক্তি হীন ননসেন্স জাত ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহায্য করে।

সুকুমার অল্প বয়সী বন্ধুদের নিয়ে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নাম দিয়েছিলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে উদ্ভট, আজগুবি রসের নানান কবিতা, নবাটক ও গল্পের অবতারনা করতেন। উদ্ভট ও অসম্ভবের সমাবেশে পাঠক মনে হাস্যরসের স্ফূরণ ঘটাতেন বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। লুইস ক্যাচলল তার "আজব দেশে অ্যালিস" বইটিতে বাস্তব জগতকে কতাক্ষ করে দেন উদ্ভট জগতের সৃষ্টির নিরিখে। সুকুমার ও তার 'হ য ব রল' তেও সেই প্যাঁচা জজ, কোলাব্যঙ্ক, কুমির, ছুঁো, বাদুড়গোপাল সেই নামান্তরের ফসল।

সুকুমার রায় নিজেই তাঁর রচনা সম্পর্কে বলেছেন - "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই।" এই খেয়াল রসের স্ফূরণ হতে দেখি সুকুমারের অধিকাংশ রচনায়। রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন সুকুমার রায়ের রচনায় পাওয়া যায় "অবিমিশ্র হাস্যরস"। যে হাস্যরস ননসেন্স জাত। যা বাস্তবকে অস্বীকার করার জন্য সচেতন ভাবেই সুকুমার সৃষ্টি করেছেন।

হ য ব র ল সৃষ্টসমাজব্যবস্থা

চেখ লেখক ইয়ারোস্লাভ হাশোক (১৮৮৩ - ১৯২৩) তাঁর সম্পাদিত প্রানীজগৎ' নামক জীববিদ্যার সাময়িক পত্রে এমন সব পশুপাখীর পরিচয় দিতেন যা তার নিজস্ব বা স্বকপোলক উদ্ভাবিত। ভূ-মন্ডলে যাদের কোন অস্তিত্বই নেই। অথচ হাশোকের বিবৃতিতে সত্য হয়ে ধরা দেয়। উপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় হাশোফ যা বেতন পেতেন তাতে পুঁথিপত্র ঘেঁটে জ্ঞানগর্ভ রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই হাশোফ মাথা খাটিয়ে এমন সব নেই জন্তুদের গল্প ফেঁদে বসতেন যা সকলকেই অবাক করে দিত।

হাশোক, এইচ জে ওয়েলস-র সমপর্যায় ভুক্ত কমেড়িয়ান লেখক সুকুমার রায়। সুকুমার তার রচনায় এমনসব জীব জন্তুর সৃষ্টি করেছেন যা শিশু মনকে আনন্দ রসে ভরিয়ে দেয়।

তবে সুকুমার সৃষ্ট সবকটি জীবই খুব নিরীহ। এদের চেহারা শিশু মনে ভীতি

উদ্রেক করে না। বরং মজাদার জীব হিসাবে এরা দেখা দেয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে নান সাহিত্য প্রতীক ও রূপকের আড়ালে অ্যানিমেল মোটফের ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। সুকুমারের জোড়কমল জীবগুলি যেমন শিশু মনে আনন্দ উদ্রেক করে তেমনিই পশুর রূপকে মানব চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত ও বহন করে। 'হ য ব র ল' এ সৃষ্ট বেড়াল, কাক, ছাগল, কুমির, শেয়াল, প্যাঁচা, ব্যাঙ, চামচিকে প্রভৃতির মধ্যে তিনি মানুষের অ্যানিমেশন এনেছেন। শিশু মাত্রেই কল্পনা প্রান। তাই শিশু কল্পনায় প্রানী মাত্রেই মানুষের ক্ষমতা সম্পন্ন। সুকুমার তাঁর দার্শনিক চেতনা সম্পন্ন মন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছিলেন সেই উপলব্ধিজাত দর্শনতত্ত্বই তাই চেনা জগতকে নতুন তাৎপর্যে তুলে আনেন। সেখানে কাক হয়ে যায় - "শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে"। মানুষের মতো তার একটি নিদিষ্ট ঠিকানা থাকে। সেখানে "৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি"। এই কাক হিসাব শাস্ত্র বিশারদ। ব্যবসায়ী মানুষের মত এই কাক বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবসা গেঁদে বসেছে। সেই সাথে সুচতুরভাবে খরিদ্দার গনকে সতর্ক করতেও ভোলেন না। ছাগলহয়ে ওঠে "শ্রী ব্যকরণ শিং বি এ খাদ্য বিশারদ"। রাজনৈতিক নেতাদের মত এই ছাগল বক্তৃতা দিতে মঞ্চে ওঠে বক্তৃতার বিষয় - "ছাগলে কিনা খায়।" হিজিবিজবিজ এর সাথে এই ছাগল আবার তর্ক করে। হিজিবিজবিজ ন্যাড়ার গাকওয়া গান শক্ত বললে। ছাগল প্রতিবাদ করে বলে ওঠে - শক্ত আবার কোথায়? ওই শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তা ছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।" শজারু ফোৎ ফোৎ করে কাঁদতে থাকে ল আর কুমির বিজ্ঞ মানুষের মতো তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে - "কেদোঁ না কেদোঁ না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোলা ব্যাঙ 'মানহানি মোকদ্দমা" করার কথা বলে। প্যাঁচা 'জজ' হয়ে নালিশ বাতলাও বলে আদেশ দেয়। কুমির চোখের মধ্যে নখ দিয়ে "খমচি" কেটে জলবের করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। শেয়াল উকিলের মতো জেরা করতে থেকে। শেয়াল, সেখানে 'জজ' প্যাঁচাকে উদ্দেশ্য করে বলে - "হুজুর তা হলে বাদুড় গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।"

কোলাব্যাঙ চিৎকার করে বলতে থাকে - "বাদুড় গোপাল হাজির" শেষ পর্যন্ত বাদুড় গোপাল উপ্থিত না হওয়ায়, শেয়াল আবার বলে - "তা হলে হুজুর ওদের সক্কলের ফাঁসি হুকুম হোক।" বিচারের অন্যাথ্য তা দেখে কুমির পুনরায় "আপিল করার কথা ভাবে। কুমিরের প্রসঙ্গ উঠতেই ছাগল রূপ ব্যাকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে কেঁদে ওঠে। কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই, ছাগল বলে - "আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।"

এই জীবজন্তু আদপপে কারা, সুকুমার নিম্নতর প্রানীদের নিইরখে মানুষের কথা তুলে ধরেছেন সুচতুর ভাবে। এই পন্ডকুল সকলেই নিজ নিজ আত্ম সম্মান রক্ষার্থে সচেষ্ট।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সামকান্য কারনে তাদের পদমর্যাদা হানি হলে তারা রীতি মতো কৈফিয়ৎ তলব করে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। আবার আমাদের সমাজের বিচার ব্যবস্থার যওএ "খোল নলচে" অবস্থা তা দেখাতে ও তিনি ভোলেন না। হিজিবিজবিজ সাক্ষী দিতে উঠে ; জজ; এর ঘুমোনোর কথা বললে। জজ রূপী প্যাঁচা বলে - "কখনও আমি ঘুমোচ্ছিনা, আআর চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।"

হিজি বিজবিজ বলল - "আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।" বলেই সে ফ্যাক ফ্যাক করে ভয়ানক হাসাতে লাগল।" বিচার ব্যবস্থার প্রতি এই কটাক্ষ সুকুমার সুচতুর ভাবে নিম্নতর প্রানীদের জীবনের নিরিখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। ছাগলের কান্নার মধ্যে নিজ জাতির প্রতি প্রবল টানকেই স্মরণ করায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যে মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। সেই মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে তৎপর ছিলেন সুকুমার। তাই ছাগলের নিরিখে তিনি তা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। আবার গোলামালের মধ্যে কুমিরের কোলাব্যাঙ খাওয়া কিম্বা ছুঁচোর 'কিচ কিচ' করে চ্যাঁচানোর মধ্যে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের দৃষ্টান্তকে দেখাতে চেয়েছেন। তাই সুকুমার সৃষ্ট 'হ য ব রল' - র সকল নিম্নশ্রেনীর প্রানী শুধু জন্তু হিসাবে না থেকে নামান্তর হয়ে ওঠে। মানুষের মতো তারা একে অপরের সুখে দুঃখে সমব্যাথী হয়। মানুষের মতো সুযোগ সন্ধানী আচরণে ও তারা পটু হয়ে ওঠে। মানুষের ক্রিয়া কলাপে তারা তৎপর হয়।

সংগীত ভাবনা

'হ য ব র ল' - তে সর্ব সাকুল্যে ১১ টি গান স্থান পেয়েছে ল গানগুলি সবই ন্যাড়ার কণ্ঠে গীত হয়েছে। মাথা মুন্ডহীন এই গুলি -

(১) "লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ"। ১০ বার (চিৎকার করে)

(২) "অলিগলি চলি রাম, ফুটপাতে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম।"

(৩) "নাইনি তালের নতুন আলু"। (নরম সুরের গান)

(৪) "মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে।" (মাথামুন্ড হীন গান)

(৫) "বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই শজারু, আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।"

(৬) "একর পিঠে দুই গোলাপ চাঁপা জুই সান বাঁধানো ভুঁই"

(৭) "চাঁদনি রাতের পেতনিপিসি সজনে তলায় খোঁজ নারে -"

(৮) "দই দম্বল, টোকো অম্বলল, কাঁথা কম্বল....."

(৯) "নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে....."

(১০) "রাম ভজনের গিন্নিটা, বানপরে যেন সিংহীটা"

(১১) "খুসখুসে কাশি ঘুষঘুষে জ্বর, ফুসফুসে ছ্যাঁদা বুড়োতুই মর।
মাঝরাতে ব্যাথা পাঁজরাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত?"

স্পষ্টতই বোঝা যায় এই গানগুলি সবই আজগুবি ধরনের। গানের অর্থ খুঁজতে যাওয়া হয়তো বোকামি হবে। ন্যাড়া প্রথমগানটি অর্থাৎ "লাল গানে নীল সুর" গানটি চিৎকার করে দশ বার গেয়েছে। কিম্বা "অলিগলি চলি রাম" বা "নইনি তালের নতুন আলু" অথবা "মিশিমাখা শিখিপাখা" গানগুলি শুধুই কি আজগুবি। একটু ভালোকরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে গানগুলির শব্দ চয়ন বা শব্দ ব্যবহারে চমৎকারিত্ব আছে। ছন্দ এবং অলংকারের অপূর্ব সমবর্তন লক্ষ করা যায় এই গানগুলির মধ্যে। পঞ্চম গান অর্থাৎ "বাদুড় বলে ওরে ওভাই শজারু / আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু" - গানটির মধ্যে সমাজ বাস্তবতার ছাপ সু-স্পষ্ট। চামচিকে এবং পেঁচা - আসলে যে ইদুঁর বেচারা মারা যাবিএ তাতে কোন সন্দেহ নেই। চামচিকে এবং পেঁচা - আসলে সমাজের ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। যাদের কাছে পদান থাকে দুর্বল অসহায় মানুষরা। শোষিত এবং শোষকের নামান্তরে শ্রেনী চরিত্রের এই অপূর্ব মিশ্রণ সুকুমারের কল্পনাতে একমাত্র সম্ভব। সেই সাথে এই গানটি শিশু মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে। ষষ্ঠ গানটি আবার অন্যধরনের - সেখানে "একের পিঠে দুই গোলাপ চাঁপা জুঁই" স্বর বর্ন ই এর অপূব মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। "দুই, জুই, ভুই, শুই, রুই, যুই, তুই, পুই" - প্রভৃতিতে একটা ধ্বনি ঝঙ্কার যেমন আছে। তেমনি নতুন নতুন শব্দ চয়ন শিশু মনে আনন্দ সঞ্চার করে। সেই সাথে ধ্বনি ঝঙ্কারের মাধুর্য্য শিশু মনে হিল্লোল তোলে। স্থাম নামের সাথে বিভিন্ন মাছের ও ফুলের দৃষ্টান্ত শিশু কল্পনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

সাতনম্বর গান - "চাঁদনিরাতে পেতনিপিসি" শিশু মনে এক রহস্যের সন্ধান দেয়। শাঁখচূনি ভূত, পেতনি, যারা তুলতুলে মাংস খাবে বলে আনন্দ করে। এদের সাথে ও একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে পেতনি পিসি হতে পারে তা শিশু মনে মেনে নেয়। কোন প্রশ্ন তোলে না। সুকুমার গানটির মধ্যে য়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তা কৌশল করে প্রশমন ও করে দেন। ফলে একই সাথে শিশু মনে ভয় ও আনন্দের উদ্রেক করে আট নম্বর গান। অর্থাৎ 'দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাথা কম্বল" ..... গানটির মধ্যে বৃত্তানুপ্রাসের মধুর্য্য যেমন লক্ষ করি তেমনি দই, টক, কম্বল প্রভৃতি শব্দে শিশু মন আনন্দে ভরে ওঠে। নয় নম্বর গান - "নিঝুম নিশুত রাতে একা শুয়ে তেতালাতে গানটি শিশুমনে একদিকে ভয় সঞ্চয় করে, আবার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

খিদের উদ্রেক করে। শুধ গান শুনলেই হবে না খাদ্যের ও দরকার আছে আমাদের। যে দৃষ্টান্ত এখানে কৌশলকরে সুকুমার তুলে ধরেছেন। দশ নম্বর গান - "রাম ভজনের গিন্নিটা বাপরে যেন সিংহীটা" - গানটির মধ্যদিয়ে নারী জাতির বীরত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। শিশু মন যে যুদ্ধরত রাজপুত্তর রাজকন্যার কথা ভাবে। সেই দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেতে দেখি এই গানটিতে। আবার এগারো নম্বর গান - "খুসখুসে কাশি ঘুষঘুষে জ্বর....." গানটি বাস্ত সমাজ সম্মত। মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে যে সমাজে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তার প্রকাশ লক্ষ করি এই গানটির মধ্যে। খুসখুসে কাশি ও কঘুষঘুষে জ্বর হলে যে মানুষের আয়ুফুরিয়ে আসে। তার উপর যদি ফুসফুসে ছিদ্র থেকে সেই বুড়োর তবে তার জন্য টাকা খরচ করা নিরর্থক মনে করে সভ্যতা কামী মানুষেরা। সেই বৃদ্ধর মৃত্যু কামনা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় থাকে না। বার্ধক্য জনিত কারনে শরর ভালো থাকতে পারে না। একটা না একটা রোগে ভুগতেই হয় বৃদ্ধদেরকে। যে দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হয়েছে, হাস্য রসের মোড়কে। গানটি শিশু মনে আনন্দ উদ্রেক করে বটে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এখানে লুকিয়ে আছে জীবন যন্ত্রনার এক বাস্তব চিত্র যা কোন রকম ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

সুকুমার রায় তাঁর হ য ব র ল গল্পটিতে যে সমস্ত গান তুলে এনেছেন। তা শিশু মনে যেমন আনন্দ দান করে তেমনি 'হ য ব র ল' গল্পটির কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করে। সেইসাথে শিশু মনে গল্পের এক ঘেয়েমি ভাব দূর করে শ্রোতা মনোরঞ্জনে সহায়ক হয় ল আজগুবি উদ্ভট তধরনের বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করি গান গুলির মধ্যে। আমাদের পরিউনত মন হয়তো মানতে চায় এই আজগুবি, অর্থহীন কথাবার্তা। সেখানে যুক্তি খোঁজে, তর্ক করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু শিশু মন এসবের উর্দ্ধে থেকে শুধু আনন্দ খোঁজে। বিশুদ্ধ আনন্দের উদ্রেক করে ঐ গানগুলি কাহিনির শিল্প গুনকে বাড়িয়ে তোলে।

শিশু সাহিত্য পরিচয়

শিশুদের নিয়ে লেখা হলে শিশু সাহিত্য হয় না। শিশু সাহিত্য হতে গেলে অবশ্য তা শিশু মনের উপযোগী হতে হবে। শিশু মন কল্পনার ডানাব ভর করে উড়ে যেতে চায়। সে বাস্তবের যুক্তি তর্কের ততটা ধার ধারে না শিশু মন। শিশু মন সবসময় অজানা এক রহস্য লোকে পাড়ি জমাতে চায়। ডানা ওঠা পরীর মতো তার মনোভূমি জল স্থল অন্তরীক্ষ ডানা মেলতে তৎপর। ভাবাবেগ বা কল্পনা শিশু মনের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে। শিশুদের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ সৃষ্টির জন্য রচিত হয় শিশু সাহিত্য। আনন্দ দানই এর প্রধান লক্ষ বা উদ্দেশ্য। শিক্ষ বা জ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

শিশু মনের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল - শিক্ষা - প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতনপপরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছি, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় , যেমন মধুর ছিলল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারন এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন ; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বাহুল পরিমানে মানুষের নিজস্কৃত রচনা।" - এখানেই রবীন্দ্রনাথ শিশু ও বয়স্ক মনের যথার্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন । শিশু যথার্থই পজরকৃতির সৃষ্টি। বিশিষ্ট দার্শনিক এমিল শিশুদের সম্পর্কে বলেছিলেন শিশু প্রকৃতি থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে সেটাই যথার্থ। প্রকৃতিই তার একান্ত শিক্ষ গুরু। শিশুরা যা দেখে তাই অনুসরন করতে চায়। সে বয়স্ক মানুষের মতো নিজেকে প্রস্তুত করে না। কৌশল আয়ত্ব করে না রূপকথার বানানো জগৎ তার কাছে সত্য হয়ে ধরা দেয়।

শিশু সাহিত্য সৃষ্টির নামে শিশু মনের উপর উৎপীড়ন করা অনুচিত। শিশুর মানস গঠনের যেন পরিপন্থী না হয় শিশু সাহিত্য। শিশু সাহিত্য হতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্য বা লক্ষন প্রয়োজন তা -

(১) শিশু সাহিত্য অবশ্যই হবে সাহিত্য লক্ষনাক্রান্ত।

(২) শিশু সাহিত্য চিরন্তর বিঢ়য়কে অবলম্বন করে রচিত হবে।

(৩) শিশুসাহিত্য কল্পনার বিকাশ শীলতা থাকবে, তবে তা বাস্তবকে উপেক্ষা করে না।

(৪) শিশু সাহিত্যে খঅবশ্যই শিশু মনের উপযোগী পরিবেশ থাকবে। যে পরিবেশ অবশ্যই শিশু মনের কল্পনার উপযোগী।

শিশু সাহিত্যে কারা রচনা করে এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও বলা যায় যে বয়স্করাই শিশু সাহিত্যের রচয়িতা। তবে অবশ্যই সেই সাইত্যককে শিশু মনের উপযোগী ভাব কল্পনা রচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। শিশু মনের অধিকারী হতে হবে।

পঞ্চ তন্ত্র হিতোপদেশ, কথাসারিৎ সাগর প্রভৃতি রচনায় মধ্যে দিয়ে শিশু মনকে আকৃষ্ট করা হতো। 'বালক বন্ধু', 'সখা', 'সাথী' বা 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় শিশু মননের কউইপযোগী রচনার সূত্রপাত ঘটে। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তার 'সন্দেশ' পত্রিকাতে শিশু মনের আনন্দদায়ক রচনাকে স্থান দিয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোরের পর তার পুত্র সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় সম্পাদক হন। পরে সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ রায়

টিপ্পনী

সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদনা করে পত্রিকা ও পরিবারকে যশস্বী করে তোলেন।

টিপ্পনী

সুকুমার তার আবোল তাবোল; হ য ব র ল, পাগলা দাশু, প্রভৃতি রচনাতে শিশু মনের দরজা খুলে দিয়েছেন। এখানে সুকুমার এখানে যেন এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যে জগতে শিশুর মন প্রাণ কল্পনার রঙিন আলোকে ভেসে যেতে তৎপর। 'হ য ব র ল' এ সৃষ্ট চরিত্র, ঘটনাবলী এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি সবাই শিশু মনস্তত্তের নিরিখে রচিত। শিশু মন এখানে মুগ্ধ হয়, কল্পনা করতে ভালোবাসে। কল্পনার রঙিন জগতে উড়ে বেড়াতে তৎপর হয়। ভাবের উপযোগী ভাষার উপযোগী ছন্দ এবং ছন্দের উপযোগী ধ্বনি ঝঙ্কার যেন শিশু মনে বন্যার প্লাবনক এনে দিলেন সুকুমার। সুকুমারের মকত এমনক কবিতা ও ছড়ায় ভাষার তাজমহলল সৃষ্টি আর কাউকে দেখা যায় না।

ঋনস্বীকার

(১) সুকুমার রচনা সমগ্র (অখন্ড); শুভম, ৭ শ্যামচরন দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩।

(২) শতায়ু সুকুমার : সম্পাদনা - শিশির কুমার দাশ : কারিগর, ৩৫ বি, কল্যান ওয়েষ্ট রোড়, কলকাতা - ৪।

(৩) রঙিন আকাশ রঙিন মন ১২৫তম জন্মবর্ষে সুকুমার রায় ; সম্পাদনা - সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - ২০১৩।

(৪) সাহিত্যিক (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ) - অধ্যক্ষ ডঃ সুবোধ চৌধুরী, জয়দর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা - ৯

সাম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) সুকুমার করায়ের হ - য - ব - র - ল তে যে ননসেন্স এর হাতছানি লক্ষ করা যায় তা বিশ্লেষন কর।

(২) হ - য - ব - র - ল আসলে কি জাতীয় রচনা বলে তুমি মনে কর।

(৩) নিম্নতর জীব জন্তুর মধ্যে যে মানবত্ব আরোপ করেছেন সুকুমার রায় তা হ - য - ব - র - ল এর গল্পগুলি বিশ্লেষন করে দেখাও।

(৪) হ - য - ব - র - ল এ সৃষ্ট গানগুলি কাহিনীতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলে তুমি মনে করো।

(৫) সুকুমার আসলে কাদের লেখক?

(৬) শিশু সাহিত্য হিসাবে 'হ - য - ব - র - ল' কতখানি সার্থক।

(৭) 'হ - য- ব - র - ল' তে উদ্ভট বা আজগুবি রসের যে অবতারনা করা হয়েছে তা আলোচন করো।

(৮) 'হ - য- ব - র - ল' এর বিষয় বস্তুতে যে জীব জন্তু স্থান পেয়েছে তাদের নিরিখে সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার পরিচয় দাও।

(৯) সমাজ সচেতন কবি সুকুমার রায় তার 'হ - য- ব - র - ল' সমাজের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তা আলোচনা করো।

(১০) 'হ - য- ব - র - ল' তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয় মেলে তা আলোচনা করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক উড়কি ধানের মুড়কি (অন্নদাশঙ্কর রায়)

টিপ্পনী

অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া ও পরিচিত

বাংলা ছড়ার জগতে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২) একজন স্মরনীয় ব্যাক্তিত্ব। মুখে মুখে ছড়া কাটার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তাতে আমাদের বিস্ময় জাগে। তার ছড়ার মধ্যে শুধু আনন্দ উদ্রেক করে না। এক প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন ও ধরা পড়ে ল তার শিশু পাঠ্য ছড়া গুলো৯ যেমন শিশুকে আনন্দ দান করে তেমনি সমাজ সম্পর্কে আমাদের ভাবাতে ও সাহায্য করে ল আবার সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে তার ছড়া গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বলাভালো হাসির ছলে লেখা ছড়া গুলি যেন লেখকের জীবনদর্শন হয়ে ধরা দেয়।

"তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ কর
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর।"

কি অপুর্বজীবন দর্শন এই ছড়ায় ধরা দেব তা ভাবতে অবাক লাগে। অন্নদাশঙ্কর ছড়ার মধ্য দিয়ে যেন আমাদের তৎকালীন সমসাময়িক রাজনৈতিক মতাদর্শের হীন চক্রান্তকে স্মরন করিয়ে দেয়। দেশভাগ, মানব, জাতীয় জীবনে যেকী ভয়াবহতা সৃষ্টি করতে পারে তার এক বাস্তব চিত্র। ছড়ার মধ্যদিয়ে তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লিখিত তেরোখানি ছড়া সংকলন লক্ষ করা যায়। যথা - উড়কি ধানের মুড়কি (১৯৪২); 'রাঙা ধানের খই' (১৯৫০); 'ডালিম গাছে মো' (১৯৫৮); 'আতাগাছে তোতা (১৯৭৪); 'হৈরে বাবুই হৈ' (১৯৭৭); 'রাঙা মাধায় চিরুনী' (১৯৮০); 'বিন্নি ধানের খই' (১৯৮৯); ''সাতভাই চম্পা' (১৯৯৪); 'দোল দোল দুলুনি' (১৯৯৮); 'রাঙা ঘোড়ার সওয়ার' (২০০২); 'শালিধানের চিড়ে' (১৯৭২) 'যদু এতো বড়ো রঙ্গ' (১৯৯৪) প্রভৃতি। এছাড়া ও 'অগ্রন্থিত ছড়া (২০০২) প্রকাশিত হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উড়কি ধানের মুড়কি ছড়া গ্রন্থটি বড়োদের জন্য রচিত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ছড়া সমগ্র' গ্রন্থটিতে তেমনি বিভাজন রেকা লক্ষ্য করা যায়।

টিপ্পনী

ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য

অন্নদাশঙ্কর তাঁর নিজের ছড়া সম্পর্কে বলেছেন - "আমার নিজের ছড়া লেখা শুরু হয়েছিল এইভাবে - 'এক পয়সায় একটি সিরিজের জন্য বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন ল তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজি ক্লেরিইউ, লিমেরিক, রুথলেস রাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না।" ছড়ার নিদিষ্ট কোন বাঁধা ধরা নিম নেই। কিছুটা ইউমারাস বা ননসেন্স টাইপের। ছড়া আকস্মিক, ইয়রেগুলার। ছড়া রচনা করতে গেলে অবশ্যই আর্ট থাকবে। কিন্তু ত আহতে হবে স্বতস্ফূর্ত, কোন কৃত্রিমতার স্থান সেকানে থাকবে না।

ছড়ার ছন্দ হবে একটাই। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "ছড়ার ছন্দ্।" যা একটু দুলকি চালে চলে। অন্নদাশঙ্কর নিজেই দুলকি চালেই ছড়া রচনা করেছেন। ছড়ায় ভাব ও ছন্দ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ইমেজ। তবে এই ইমেজ হঠাৎ ধরা পড়ে। ছড়া মুলত গ্রাম্য নর-নারীরা মুখে মুখে কেটে থাকেন। রবিন্দ্রনাধ তার লোকসাহিত্য প্রবন্ধে বহু ছড়া সংগ্রহ করেছেন। যা লোক মানুষের নিজস্ব সম্পদ। তা স্বতস্ফূর্ত। ঘষে মেজে ছড়াকে ভদ্র সমাজে তুলতে গেলে তার 'নন্দনতত্ত্ব' হারিয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায় তার সৌন্দর্য বোধ। বহু বছর আগে মেয়েরা, চাষীরা, শিশুরা ছড়া বানাতো। তাদের নাম অজানা থেকেই গেছে। লোক সাহিতভের পাতায় দু-একজন ঠাই পেয়েছেন বটে, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। ছড়া বানানো, ছড়া কাটা এবং মুখোমুখি তার প্রচলন হওয়ার রীতি থেকে সরে এসে শিক্ষিত মানুষ ও ছড়া বানাতে তৎপর হচ্ছেন। তাই বলতে পারি ছড়া হয়তো জীবনে স্বাদ বা রস দিচ্ছে অন্যভাবে। যা লেখকে ও পাঠককে উজ্জীবিত করেছে। শিশু মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে। যতই তার মধ্যে ননসেন্স ভাব থাক না কলেন। তা অবশ্যই আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। সেই সাথে ছড়ার মধ্যে লেখকের জীবন দর্শন ও রা পড়েছে সমভাবে।

ছড়া সম্পর্কে ১৯৫৫ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রী পূর্নেন্দুশেখর পাত্রীকে লিখিত এক পত্রে অন্নদাশঙ্কর জানাচ্ছেন - "রবীন্দ্রনাথের ছড়া ও আমার কানে ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ার লাইন ওভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়, কিন্তু এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা বা সময় ছিল না আমার।" ছড়া লেখা হয় না। ছড়া কাটা হয়। ছড়া কাটতে হয় মুখে মুখে। ঠাকুমা, দিদিমারা মুখে মুখে ছড়া কাটেন। ফলে ছড়াকে মৌখিক বা ওরাল ট্র্যাডিশন হিসাবে গন্য করা হয়। ছড়া মুখে মুখে রচিত হয়ে তা আবার মিলিয়ে যেত। ছড়া

সহজেই মুখস্ত হয়ে যাবে। সহজেই তা মুখে মুখে ঘুরবে। এবং ছড়া রচয়িতাকে একদিন না একদিন মানুষ ভুলে যাবে। যেমন ভুলে গেছে - "আগডুম বাগডুম" এর রচয়িতা কে।

টিপ্পনী

ছড়া কাটা একটা সাধারন ব্যাপার। সাধনা না থাকলে ছড়া কাটা বা রচনা করা সম্ব নয়। 'খুকুমনির ছড়া' একটা আদর্শ দৃষ্টান্ত। ছড়ার সাধনা প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্করের মন্তব্য - "লোক সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের রচনা যোগ করতে ইচ্ছে করেন ধাঁদেরও সেই রকম একটা সাধনা বরন করতে হবে। সাধনা অনুসারে সিদ্ধি। ছড়া এক প্রকার আর্টলেস আর্ট। শিশুরা সহজে পারে, বয়স্করা সহজে পারে না। মেয়েরা সহজে পারে। পুরুষেরা সহজে পারে না। অশিক্ষিতরা সহজে পারে, শিকইতরা সহজে পারে না। মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পন্ডিতে লাগে ধন্দ।" - এই উপলব্ধি থেকেই হয়তো অন্নদাশঙ্কর একে একে রচনা করেছেন তার 'উড়কি ধানের মুড়কি' ; 'শামি ধানের চিড়ে', 'ডালিম গাছে মৌ' প্রভৃতির মতো ছড়া গ্রন্থ।

উড়কি ধানের মুড়কি প্রকাশ ও কথামুখ

"উড়কি ধানের মুড়কি" সংকলনটিতে মোট ১১৩টি ছড়া স্থান পেয়েছে। মূলত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ছড়া সংকলন গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - (১) ছোটোদের ছড়া ও (২) বড়োদের ছড়া। বড়োদের ছড়ার মধ্যে স্থান পেয়েছে "উড়কি ধানের মুড়কি" গ্রন্থটি। "উড়কি ধানের মুড়কি" প্রকাশক শ্রী গোপাল দাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরনী, কলিকাতা - ৬। গ্রন্থটি প্রচ্ছদ আঁকেন শ্রমতী লীলা রায়। শ্রী দিলীপ কুমার রায়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ল পর পর ছয়টি সংস্করন প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। অন্নদাশঙ্করের প্রতিটি ছড়া সংকলনের একটি করে কথামুখ লক্ষ করা যায়। এখানেও তার ব্যাতিক্রম লক্ষ করা যায়। এখানেও তার ব্যাতিক্রম নয়। এই বইয়ের কথামুখটি ছিল -

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ি ভুলাতে।"

টিপ্পনী

বিভিন্ন ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা

'উড়কি ধানের মুড়কি' গ্রন্থের প্রথম ছড়া 'ক্লরিহিউ'। ছড়াটি আশ্চর্যধরনের শব্দ প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। শুধু ছন্দএর মিল অর্থৎ অন্ত্যানুগ্রাসের প্রয়োগ ঘটানোর জন্য এই মিলকেই লক্ষ করি। সেখানে-

"আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদকে বলেছেন পশু।"

স্বভাবতই 'বসু' র সাথে 'পশু' শব্দের শ্রুতি মাধুর্য্যের জন্য শব্দ দুটিকে স্থাপন করা হয়েছে। শুধু জগদীশ বসু কেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পন্ডিত জহরলাল, সমরেশ সেন, অনামিকা দে পরভৃতি ব্যাক্তিত্বের নাম মাধুর্য্যের সাথে সাধুর্য্য রেখে শব্দ প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে।

ছড়াটির শেষ স্তবকটি ও বেশ আনন্দদায়ক। সেখানে-

"শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সবকটি ভালো ভালো মে
সকলের হয়ে গেছে বে।"

- 'দে' র সাথে 'সে' ও 'মে' র সাথে 'বে' শব্দের প্রয়োগ ছড়াটি ধ্বনি মাধুর্য্য যেমন ফুটে উঠেছে। তেমনি মুখরোচক হাস্যরসের আভাস ও এখানে মেলে। ক্ষনিক আনন্দ দিয়ে এই হাস্যরস আবার কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়।

পন

'পন' ছড়াটি মধ্য দিয়ে লেখক হাস্য রসের আধারে বাস্তব জীবন দর্শনকে তুলে ধরেছেন। সমাজে পনপ্রথার কদর্যময় বাস্তব চেহারা অন্নদাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন। 'পন' প্রথার সেই ভয়াবহ দিকটি হাস্যরসের নিরিখে তুলে ধরেছেন। ছড়াটি পাঠে হাসির যেমন উদ্রেক করে; তেমনি সমাজের হীন চরিত্র মানুষদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ বা প্রতিবদ্দ ও দেখানো হয়েছে। ছড়াটির পাঠে সেই দৃষ্টান্ত লক্ষ করি। সেখানে-

করেছি পন, নেব না পন
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ন দেবে কয় ভরি।"

'পন' নেব না বললে প্রতিজ্ঞা করছে অথচ স্যাকরা ডেকে সোনার ওজন ও গুনগত মান যাচাই করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত ও এখখানে ঠাঁই পেয়েছে। এই দৃষ্টান্ত শুধু হাসি উদ্রেকের জন্য বলে মনে হয় না। বাস্তব সমাজ সমস্যার জ্বলন্ত উদাহরন এটি। তৎকালীন সমাজজের বিবাহ যোগ্য পাত্রের মনের একান্ত গোপন অথচ কপট ইচ্ছা এটি । যা অন্নদাশঙ্কর হাসির ছলে তুলে ধরেছেন। ছড়ার শেষ অংশটি ও বেশ চমকপ্রদ। সেখানে-

"মানতে হলো দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্নের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।"

অর্থাৎ 'পনের' বরাদ্দঅর্থের জোরেই কুৎসিত পাত্রী ও সুন্দরী হয়ে যায়। আর চাকরী করা পাত্র যতই দেখতে খারপ হোক না কেন মাইনের জোরে সমাজের চোখে সে ময়ুর ছাড়া কার্তিক বনে যায়।

পোড়ামাটি

'পোড়ামাটি' ছড়াটির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম স্বর্গের চিত্রাঙ্গদা পুত্র বীরবাহুকে স্মকরণ করায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই ছড়াটি বীরনবাহুকেই ব্যাঙ্গ করতেই রচিত হয়েছে।

"সম্মুখে সমকর এরি' বীরচূড়ামনি
বীরবাহু চলি ঘরে গেলা বীরভূমে
.....
.....

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাহু দ্বয় উর্দ্ধে তুলি স্মরিলা ঈশ্বর।
ট্রেন ছেড়ে দিল। সূর্য গেল অস্তাচলে।"

- তবে স্বদেশ ভূমি রক্ষার জন্য বিরের আত্মত্যাগের কথা যেমন এখানে আছে, তেমনি ইংরেজদের অপকৃত্তির কথা এআনে ধরা পড়েছে।

হিতোপদেশ

'হিতপদেশ ছড়াটি বেশ মজার। খুড়ো এবং খুড়ি কে নিয়ে এই ছড়াটি রচিত। অন্তে মিল রেখে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে সেখানে-

"খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
সঙ্গে ঢুকে গপ্প জুড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো।
খুড়ি গো খুড়ি হামাগুড়ি
খাটের তলায় লেপের মুড়ি।
সঙ্গে রেখো টাকা কুড়ি
নইলে কখন যাবে চুরি।"

'খুড়ির' সাথে হামাগুড়ি' শব্দের মিল থাকার জন্য শুনতে ও বেশ চমৎকলার লাগে।আবার খাটের নীচে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা যতই কষ্টকর হোক না কেন, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা বেশ মজাদার মনে হয়। টাকা কড়ি উরি যাওয়ার ভয়ে তা সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া কহব।

পারিবারিক

পারিবারিক ছড়াটি ঐতিহাসিক ঘটনা সমন্বিত। পটলের মা ওবাপের প্রসঙ্গের সাথে বর্গী, বর্মা ও শর্মা শব্দের অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়।

উভয় সঙ্কট

উভয়সঙ্কট' ছড়াটি লেখকের জীবনদর্শনের এক একটি উদা্রণ। রাজনৈতিক

মতাদর্শের ঘেরাটোপে গড়ে উঠেছে এই ছড়াটি। যেখানে -

"হবে না শুনলে সুখী নয় এরা,
হবে কি হবে না, কেবলি শুধায়
উত্তেজনায় কম্পিত।"

খাজনা না দিতে পারা মৃতপ্রায় প্রজা, সদ্য জন্মানো সন্তান সকলের জন্য আমরা কিই বা রেখে যেতে পারলাম। ঘুনধরা সমাজ ব্যবস্থার অন্তসার শুন্য সারবত্বা ছাড়া কিছুই নতুন প্রজন্মকে দিতে পারি না। যে উপলব্ধি দৃষ্টান্ত এই ছড়াটি। হাসির ছলে এটি রচিত হলেও লেখকের বাস্তব জীবনাদর্শন এটি রচিত হলেও আমাদের সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, প্রভতি ক্ষেত্রে ভাবাতে ও সাহায্য করে।

পিতাপুত্র সংবাদ

পিতাপুত্র সংবাদ ছড়াটির মধভে ইতিহাসের লক্ষন র্বমান। জাপানীরা ভারতবর্ষে আসললে দেশের যে কি চরম দুর্দশা ঘনিয়ে আসবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অযোগ্য লোক ক্ষমকতার শিকরে বসবে। মুর্খের রাজত্বে সকলকেই বাস করতে হবে। সেইসাথে খুন, নারী ধর্ষন নাটকীয় হত্যালীলা দিন দিন বেড়ে যাবে। পিতা, পুত্রের কথোপকথনে তাই জানতে পারি -

পিতা: জাপানীরা যদি আসে
সাত টাকা যার যোগ্যতা নয়
ষাট টাকা পাবে মাসে।
.....
.....
স্বরাজ স্বরাজ সবাই চ্যাঁচায়
স্বরাজ কি ফলে গাছে।

স্বরাজ রয়েছে আধ পসায়
আস্ত কাতলা মাছে।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পুত্র : জাপানীরা যদি আসে
চন্দ্র সুর্য উঠবে না, আলো
ফুটবে না মহাকাশে।
ফুটপাথে হবে লুট পাট, আর
বাটপারি হবে বাটে
ঘাটে ঘাটে হবে নারী ধর্ষন
খুন হবে মাঠে মাঠে।
.....
স্বরাজ স্বরাজ যে জন চ্যাঁচায়
সে জন জাপানী চর
আমাদের বানী রাশিয়ার মতো
গোরিলা যুদ্ধ কর।

শেষ পর্যন্ত পিতা ইংরেজ পুলিশের ভয়ে 'দুর্গা দুর্গা' নাম জপ করতে থাকে। পুত্র যদিও ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানীদের তাড়ানোর পথকে প্রশস্ত করে ফেলেছে।

শঙ্করন্ নম্বুদিরি

ছড়াটিতে নাচের বিভৎসতা দেআনো হয়েছে। "দুঃশাসনবধ কথাকলি নৃত৬ভ দেকানোর অব্যবহিত পরে আচার্য শঙ্করন্ নম্বুদিরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

শঙ্করন্ নম্বুদিরি সেই নাচের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এখানে -

"নাচতে নাচতে খুলে যায় কারো কেশ
কারো খসে পড়ে বেশ।
নগ্ন তনুর সীমাহীন শিখা
হয় না তো নিঃশেষ।"

হনুমান জয়ন্তী

টিপ্পনী

ছড়াটির মধ্য দিবে হনুআনের কীতফি কলাপ তুলে ধরা য়েছে। হনুমান শুধু মাত্র 'লঙ্কা পোড়ায় নি। সেখানে সে নিজের মুখও পুড়িয়েছিল। সেই সাথে ছেলের মুখ, নাতির মুখ, জাতির মুখ ও দেশের মুখ ও পোড়াতে সে বাকী রাকে নি।

সাতভাই চম্পা

"শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে' র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক" এই ছড়াটি রচনা করা হয়েছে। যারা দেশেরও দশের মাথা সেই চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী, মুখার্জীদের ব্যঙ্গ করতেই ছড়াটি রচিত হয়েছে-

"চটি ফটর্ট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেন গুপ্ত দাশ গুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী"

এরাই সরকার চালান, জেলখানাতে এরই নবন্দী থাকেন, এরা গুপ্তচর বৃত্তি করে ফাঁসি কাঠে ঝোলেন। জমিদার, মহাজন, কৃষক, চাষী, মিলমালিক, মজুতদার প্রভৃতিদের সাথে কোন না কোন সম্পর্কে এরা জড়িত।

"চোর রাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এরায় তবু সম্পাদকীয় কাঁদুনী গান গায় রে হায়।
এঁরাই নিলা যম করে জমি, এরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা - গোরু মেরে জুতো দান।"

এমনই আশ্চর্য জনক ঘটনা ধারাকে অন্নদাশঙ্কর হাসির ছলে পরিবেশন করেছেন। সত্য তা সে যতই নির্মম হোক না কেন শুনতে বা মানতে কষ্টকর। লেখক এই নির্মম সত্য টি এখানে আসির ছলে পরিবেশন করে পাঠককে আনন্দ দান করেছেন। সাই সাথে দেশের ও দশের মাথা চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী ও মুখার্জী দের উচিত শিক্ষা দেওয়ার ও ব্যবস্থা করেগেচেন। দেশের মাথা স্বরূপ "সাতভাই" দেরপ্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক সমাজের

মর্মমূলে আঘত হানতে চেয়েছেন লেখক।

টিপ্পনী

নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকেই স্মরণ করায় ছড়াটি। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে যকন দেশ উত্তাল তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরাতে নজরুল তৎপর ছিলেন ল তার সেই মানবিক মূল্যবোধ জনিত জীবন দর্শন ধরা পড়ে এখানে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় যখন সকলেভিত সন্ত্রস্ত, তখন কবি নজরুল সকলকেই মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ এই ভেদনীতি ভুলে তিনি দেশের ও দশের কাছে একটাই পরিচয় রাখেন তা হল মানুষ। মানুষ ছাড়া আর আর যেন তার কোন পরিচয় না থাকে। কবি নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে অন্নদাশঙ্কর বলেন-

ভুল হয়েগেছে
বিলকূল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয় নিকো
নজরুল।
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক।"

গিন্নী বলেন

ছড়াটিতে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

"যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিষ্টি।"

মুর্শদাবাদে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য কমিউনিস্টি দায়ি। পাব না ভেসে যাওয়ার জন্য দায়ি কমিউনিস্টি। পাপিষ্টি, প্লেগ, সংস্কৃতি নষ্ট হওয়া প্রভৃতির জন্য দায়ি কমিউনিস্ট রা। "এ পাড়ার কে কে কমিউইনিষ্ট" আছে তার একটা লিস্টি বানাচ্ছে লেখক।

টিপ্পনী

বঙ্গদর্শন

ছড়াটি সংসার সমকস্যা কেন্দ্রিক। চুন, কালি, কিভাবে 'ডানগালী, বাঁ গালি থেকে 'ডাঙ্গালী, বাঙ্গালী বনে যায় তা দেখানো হয়েছে। সেই সাথে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে সংসার হাসানোর দৃষ্টান্ত ও এখানে বেশ মজাদার ভাবে ফুটে ওঠে।

নাসিকের পরে

ছড়াটিতে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে বেশ মজার ছলে। 'নাক কান কাটা' ও 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা" প্রবাদ দুটির পরিবেশন বেশ মজাদার।

"বলতে ছিললেম মাসিকে
নাক কান কাটা হলো কনা এবার নাসিকে।
উক্ত মহান কার্য
মনে হয় অনিবার্য।
শাক দিয়ে মাছ যায় নাকো ঢাকা
ডেকে নিয়ে আসে
মাছিকে।"

আমরা আমাদের অপকীর্তকে যতই ঢাকার চেষ্টা করিনা কলেন তা একদিন না একদিন বেরিয়ে পড়বেই। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকলেই তা যেমকন মাছিকে ডেকে এনে সকললকেই জানান দেয়, তেমনি ঘটনা এখানেও বর্তমান।

বারো রাজপুত

"জননী গো তুমি
নমস্য

টিপ্পনী

তোমারেই নিয়ে
সমস্যা”

এখানে ‘জননী’ অর্থে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের কর্মতৎপরতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে ‘বামমার্গীয় সদস্য’ দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রাজনৈতিক আবহ তৈরী করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া সমগ্র

প্রকাশক - অবনীন্দ নাথ বেরা, বানীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রশ্ন

(১) ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য ব্যাখ্যা কর।

(২) ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত কি?

(৩) ‘পন’ ছড়াটির মধ্য দিয়ে পনপ্রথার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা আলোচনা কর।

(৪) ‘পোড়ামাটি’ ছড়াটির মধ্যদিয়ে যে স্বদেশ প্রীতি ধরা পড়েছে তা আলোচনা কর।

(৫) ‘উভয় সংকট’ ছড়াটির মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের কোন দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন বলে তুমি মনে কর।

(৬) ‘পিতা পুত্র সংবাদ’ ছড়াটির মুল বক্তব্য বিষয় আলোচনা কর।

(৭) ‘সাত ভাই চম্পা’ ছড়াটির মধ্যে দিয়ে লেখক সমাজের উচ্চসম্প্রদায়ের প্রতি যে কটাক্ষ হেনেছেন তা আলোচনা কর।

(৮) অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ায় যে রাজনৈতিক মতাদর্শ ফুটে উঠেছে তা পঠিত ছড়া অবলম্বনে আলোচনা কর।

(৯) ‘গিন্নী বলেন’ ছড়াটির মূল বক্তব্য বিষয় আলোচনা কর।

(১০) অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার মধ্যে যে স্বদেশ প্রীতি ও মানবতাবোধ ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর।

তৃতীয় একক প্রফেসর শঙ্কু (সত্যজিৎ রায়)

টিপ্পনী

উদ্দেশ্য

সত্যজিৎ রায়কে মূলত খ্যাতি এনে দিয়েছে তাঁর চলচিত্র নির্মান। চলচিত্রের বৃত্তের বাইরেও যে তাঁর নানাবিধ সৃজন কর্ম রয়েছে তা বেশির ভাগ মানুষেরই অজানা। তিনি ছিললেন দক্ষ চলচিত্রশিল্পী। ছোটগল্পকার। সর্ব্বোপরি গোয়েন্দা কাহিনী ফেলুদার সৃষ্টিকর্তা এবং কল্পবিজ্ঞান ধর্মী রচনা শঙ্কু সমগ্র'র নির্মাতা। আমাদের পাঠ্য শঙ্কু সমগ্র সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান বিঢ়য়ক গল্প। এই গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'ফ্যান্টাসি', রয়েছে রোমাঞ্চ। মানসলোকে পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে অন্যতর গ্রহে ভ্রমনের চমক, আনন্দ ও অভিজ্ঞতা। এই গল্পগুলির মূল চরিত্র প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর বিচিতর নির্মাণ, আবিষ্কার ও অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা পাঠকবর্গের মনে গভির ছাপ ফেলে। ভাবায়। এরই সমান্তরালে আমরা দেখতে পাই সত্যজিতের কল্পনা প্রবন ও বিজ্ঞান প্রিয় মন। সত্যজিতের কল্পনা প্রবন ও বিজ্ঞান প্রিয় মন। সত্যজিতের এই 'শঙ্কু সমগ্র' বাংলা সাইত্যের যে এক ্গাশ্চর্য ব্যাতিক্রমী বিষয় তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি ল এই গল্পগুলি পড়লে। একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে থাকে পাঠক মনে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই জরুরী, তা হল মহাকাশ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে একটা সযত্ন কৌতুহল জাগ্রত হয় আমাদের। তার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশ্মাত্মক উদারতায় ভরে ওঠে আমাদের মনোজগৎ। কাজেই বলা যায় 'শঙ্কু সমগ্র'র গল্পগুলি পাঠের উদ্দেশ্য হল মনের দরজাকে দরাজ করে দেওয়া বিশ্বের - মহাবিশ্বের আশ্চর্য সব কর্মকান্ডের কাছে। কল্পনাচায়ী মনটাকে সজীব করে তোলা। পাঠককে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতুহলী করে তোলা। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের এক নিবিড় সম্বন্ধকে বুঝে নেওয়া। সর্বোপরি সত্যজিতের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি হওয়া।

ভূমিকা

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যজৎ রায়ের জন্ম (২মে, ১৯২১) কলকাতা শহরের এক খ্যাতনামা বাঙালী পরিবারে। তাঁর আদি পৈত্রিক ভিটা বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে। তাঁদের এই পৈত্রিক বাড়িটি এখনো সেখানে রয়েছে ল এই জায়গাতেই জন্মেছিলেন সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং পিতা সুকুমার রায়।

টিপ্পনী

উপেন্দ্রকিশোরের সময়েই সত্যজিতের পরিবারের ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নেয়। লেখক, চিত্রকর, দার্শনিক, প্রকাশক ও শখের জ্যোইতির্বিদ্যা উপেন্দ্রকিশোরের মূল পরিচিতি উনিশ শতকের বাংলার এক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম, পথিকৃৎ হিসেবে । উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা 'ননসেন্স' কবিতা ও শিশু সাহিত্যের প্রথম সারির লেখক। একই সঙ্গে তিনি দক্ষ চিত্রকর ও সমালোচক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ১৯২১ সালে কলকাতায় জন্ম নেন সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিত রায়। তিন বছরের শিশু সত্যজিৎ কে রেখে বাবা সুকুমার রায় মারা যান। মা সুপ্রভা দেবী বহু কষ্টে তাঁকে বড় করেন। সত্যজিৎ বড় হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু চারুকলা ছিল তাঁর অন্যতম ভলোলাগার ক্ষেত্র ।পরে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন ল সেখানে তিনি বিখ্যাত চিত্রশিলপী নন্দলাল বসু এবং বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে অনেক কিছু শেখেন। এরপর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। চলচিত্র নির্মাতা হিসেবে বিশ্বশ্রুত হন। এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর সাহিত্যকর্ম।

সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু' টি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হ'ল গোয়নেন্দা ফেলুদা অন্যটি বিজ্ঞানী প্রোফেসর শঙ্কু। ইনি স্কলটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক। পরোনাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু ল তবে প্রোফেসর শঙ্কু নামেই ইনি বিশ্ববিখ্যাত। ইনি বৈজ্ঞানিক ও আবিস্কারক। ১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন।

সত্যজিৎ রায় প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজে মোট ৩৮ সম্পূর্ন ও ২ টি অসম্পূর্ন গল্প লেখেন। এই সিরিজের প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর শায়রি' ১৩৬৮ সনে (১৯৬১) সন্দেশ পত্রিকার আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রাহয়ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি হাল্কা চালে লেখা এবং এটি লেখার সময় লেখক পরোফেসর শঙ্কু চরিত্রটি নিয়নে সিরিজ করার কথা ভাবেননি । ১৯৬৪ সালে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় শঙ্কু কাহিনী 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়' থেকে মূলত শঙ্কু সিরিজের সূচনা। ১৯৬৫ সালে প্রকাসিত 'প্রোফেসর শঙ্কু' শঙ্কু সিরিজের প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে শঙ্কু সিরিজের মোট আটটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'শঙ্কু সমগ্র' গ্রন্থে এই সিরিজের সমস্ত গল্প সংকলিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রটি সৃষ্টর পিছনে প্রধান প্রেরনা ছিল সুকুমার রায়ের গল্প 'হেসোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি' । অন্যমতে এই চরিত্রে সুকুমার রায়ের 'নিধিরাম পাটকেল' চরিত্রটির ছায়া বর্তমান । প্রোফেসর শঙ্কু'র সব গল্পগুলো প্রথমে যে আটটি গল্পগরন্থে প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. প্রফেসর শঙ্কু

টিপ্পনী

গ্রন্থটি নিউ স্ক্রিপ্ট কলকাতা প্রকাশনা সংস্থা ১৯৬৫ সালে প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করনে যথাক্রমে 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও', প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্টায় আতঙ্ক', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু ও চী চিং' - এই সাতটি গল্প সংকলিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করনে 'প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ভুত' গল্পদুটি সংযুকত হয়। সব মিলিয়ে এই গ্রন্থে মোট ৯টি গল্প সংকলিত হয়।

২. প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা

১৯৭০ সালে আনন্দ পাবলিসার্স কলকাতা থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে মোট পাঁচটি গল্প ছাপা হয়। সেগুলি হ'ল 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু', প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য', 'প্রেফেসর শঙ্কু ও গপরিলা' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগ্‌দাদের বাক্স'।

৩. সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু

এই গল্পগ্রন্থটিতে পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়। সেগুলি - 'আশ্চর্য প্রানি', 'স্বপ্নদ্বীপ', 'মরুরহস্য', 'কভার্স' এবং 'ডক্টর শেরিং এর স্মরণশক্তি'। গ্রন্থটি আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিউত হয়।

৪. মহাসংকটে শঙ্কু

প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাকতা প্রকাশককাল ১৯৭৭। শঙ্কুর শনির দশা, 'শঙ্কুর সুবর্ন সুযোগ, ও 'হিপ্‌নোজেন' নামের তিনটি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থটি।

৫. স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু

মনরো দ্বীপের রহস্য', 'কম্পু' ও 'একশৃঙ্গ অভিযান' - এই তিনটি গল্প নিয়ে ১৯৮০ সালে প্রকাশ পায় এই গ্রন্থটি। এরও প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

টিপ্পনী

৬. শঙ্কু একাই ১০০

আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে ১৯৮৩ সালে চারটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। এখানে যে চারটি গল্প ছিল, সেগুলি হ'ল - 'মহাকাশের দূত', 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান', 'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও'।

৭. পুনশ্য প্রোফেসর শঙ্কু

এই গ্রন্থে চারটি গল্প সংকলিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৩ সালে গ্রন্টটি প্রকাশ করে। এর চারটি গল্প হ'ল - 'আশ্চর্জন্তু', 'কশঙ্কু ও ই আদিম মানুষ', 'শঙ্কুর পরলোকচর্চা' এবং 'প্রোফেসর রন্ডির টাইম মেশিন'।

৮. সেলাম প্রোফেসর শঙ্কু

গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৯৯৫ সাল। প্রকাশক আনন্দ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। এই গ্রন্থে মোট সাতটি গল্প আছে। তবে দুট অসম্পূর্ণ। এই গল্পগুলি হ'ল 'নেফ্রদেৎ এর সমাধি', 'ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার', 'শঙ্কু ও ফ্রাঙ্কোনস্টাইন', 'ডন ক্রিস্টোবান্ডির ভবিষ্যৎদ্বানী', 'স্বর্নপকনী', 'ইনটেলট্রন' (অসম্পূর্ন) এবং 'ডেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা' (অসম্পূর্ণ)।

এবার আমদের মধ্যে পাঁচটি গল্প সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য জেনে নিতে পারি।

১. ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

এই গল্পটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯৬১ সালকের সেপ্টেম্গবর - নভেম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬৭ সালে 'পরোফেসর শঙ্কু' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

২. স্বপ্নদ্বীপ

এটিও 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ এর মে-জুন সংখ্যায় ল পরে 'সাবাস প্রোফের শঙ্কু' গ্রন্থে ১৯৭৪ সালে অন্তভুক্ত হয়।

৩. একশৃঙ্গ অভিযান

টিপ্পনী

১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর সংখ্যার 'সন্দেশ' এ প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে 'স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু' গ্রন্থে ছাপা হয়।

৪. শঙ্কুর শনির দশা

এই গল্পট ১৯৭৬ সালে 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'য় প্রথম ছাপা হয়। পরে 'মহাসংকটে শঙ্কু' গরন্থে১৯৮০ সালে ছাপা হয়।

৫. প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও

এটিও 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলে'য় প্রথম চাপা হয়। ১৯৮২ সালে । ষ১৯৮৩ সালে 'শঙ্কু একাই১০০' গ্রমন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় গল্পটি।

শঙ্কু সিরিজের গল্পগুলি প্রোফেসর শঙ্কুর জবানিতে দিনলিপির (ডায়রির) আকারে লেখা। গল্পগুলির পটভূমি ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এছাড়া গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। প্রোফেসর শঙ্কুর নিবাস তদানীন্তন বিহারের (এখন ঝাড়খন্ড) গিরিডি শহরে। বাড়িতে তাঁর সর্বক্ষনের সঙ্গী নিউটন নামের একটি পোষা বেড়াল ও তার চাকর প্রহ্লাদ। বিশ্বের নানা দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁর বন্ধু। প্রতিবেশী অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় ও হিতাকাঙ্খী নকুড়বাবু তাঁর কোন কোন অভিযানে সঙ্গী হয়েছেন। সমগ্র শঙ্কু সিরিজে প্রোফেসর শঙ্কুর ৭২ টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা জানা যায়।

শঙ্কু সমগ্রের নির্বাচিত গল্পগুলি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

(১) ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

'শঙ্কু সমগ্র' এর প্রথম গল্প ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। গল্পের শুরুতে লেখক জানান কিভাবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি তাঁর হাতে এল। তারপর ঘটনা উত্তম পুরুষে শঙ্কুর মুখে বর্ণিত। শুধু এ গল্পেই নয়। বাকী সব গল্পের ক্ষেত্রেই এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

(১.১) ব্যোমযাত্রীর ডায়রির বিষয়বস্তু

একদিন দুপুরেদর দিকে লেখক অফিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছিলেন, এমন সময় তারক বাবু (চাটুজ্যে) একটি লাল খাতা নিয়ে এসে হাজির হন । এই লাল খাতাই আসলে প্রোফেসর শঙ্কুর। কিন্তু প্রোফেসর শঙ্কু প্রায় পনেরো বছর ধরে নিরুদ্দেশ। অনেকে অনুমান করেন তিনি একটা ভীষন পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান ।আবার এও শোনা যায় তিনি নাকি জীবিত। ভারতবর্ষের কোন অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁরই দিনলিপি লেখা ঐ লাল খাতাটি তারকবাবুর কাছে এল কি করে, সেই বিকষয়ে লেখক কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। তখন তারকবাবু জানান বছর খানেক আগে সুন্দরবনে মাথারিয়া অঞ্চলে যে উল্কাপাত হয়, তাতে অনেক জন্তুজানোয়ার মারা গিয়েছিলে। তিনি মৃত বাঘের ছাল আনবেন বলে সেখানে যান। আসলে বাঘের ছালের ভালো দাম পাওয়া যায়। কিন্তু তারকবাবুর যেতে লেট হয়ে গেল। গিয়ে কিছু গোসাপের ছাল পেলেন। আর পাথর পড়ার ফলে যে বিরাট গর্ত হয়েছিল তার মধ্যে থেকে তিনি প্রোফেসর শঙ্কুর এই ডায়রিটি পান। ডায়রিটি হাতে পেয়ে লেখক তারকবাবুকে 'কুড়িটা' টাকা দিয়ে বিদায় করলেন ল তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন লেখক আলমারি থেকে চলন্তিকা বার করতে গিয়ে সেই লাল খাতাটি বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু প্রথমবার তিনি যখন ডায়রিটা দেখেন তখন তার কালির রং ছিল সবুজ। এখন লাল। পরে যখন তিনি আবার ডায়রিটা দেখেন তখন দেখা যায় কালির রং নীল। অদ্ভুত ব্যাপার, এবার দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে ল এই ভূতুড়ে কান্ড দেখে তাঁর হাত থেকে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আড়ির কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে সেতাকে কামড়াতে শুরু করল ।আশচর্য, ঐ খাতার কাগজ কুকুরের কামড়ে কিছু হল না। এবার লেখক হাত দিবে টেনে দেখলেন যে রবারের মতো পৃষ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে আবার ছেড়ে দিলে যে কে সেই। হঠাৎ খেয়ালে এবার তিনি একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটা ধরলেন। পুড়ল না। এরপর পাঁচঘন্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দেখা গেল তাতেও পুড়ল না। কালির রং যেমন বদলাছিল তেমন বদলাল, আর কিছু হল না। এমন অদ্ভুতড়ে ডায়রিটি এবার না পড়ে আর উপায় থাকে না। লেখক আমাদের জানান-

> "সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এসব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব তা তোমরা বুঝে নিও।"

একান থেকেই শুরু হল ডায়রি। প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'

ডায়রিতে যেমন তারিক থেকে। তেমনই তারিখ দিয়ে শুরু হয়েছে এ ডায়রিও। প্রথমদিকে তারিখে থাকলেও পরের দিকে আর তারিখের হিসেব ঠিক ছিল না। তার কারন প্রোফেসর শঙ্কু এমন এমন সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন যে সাল তারিকের হিসেব তাঁর গুলিয়ে গিয়েছিল । এছাড়া পৃথিবীতে থাকাকালীন এবং মহাকাশে যাওয়ার পরও কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি তারিখ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ঘটনা - দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় আর সে সব মনে রাখতে পারেন নি।

ডায়রি লেখা শুরু হয়েছে '১লা জানুয়ারি' থেকে। এই দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল প্রফেসর শঙ্কু তাঁর আবিস্কৃত 'Snuff-gun' বা নস্যাস্ত্রটা তাঁর সাতাশ বছরের কাজের লোক প্রহ্লাদের ওপর পীক্ষা করলেন। অর্থাৎ বিশেষ ভাবে তৈরী নস্যি বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রে পুরে, বন্দুকের মত দূর থেকে গোঁফের কাছে তাক করে লাগাতে পারলে তেত্রিশঘন্টার আগে হাঁচি কমবে না । প্রহ্লাদের হ'ল ও তাই 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'তে প্রোফেসর শঙ্কুর একটি অদ্ভুত আবিষ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে।

২রা জানুয়ারী ডায়রিতে লেখা রয়েছে নিজের আবিস্কৃত রকেটের কথা। সেটির পরীক্ষামূলক উড়ান করতে গিয়ে প্রহ্লাদের ভুলে রকেটটি গিয়ে পড়ল অবিনাশ বাবুর মূলোর ক্ষেতে। তবে তিনি আশাবাদী তাঁর আকাশ যন্ত্রটিনিয়ে। ৫ই জানুয়ারীর বক্তব্য বিষয় হ'ল মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সময় তিনি সঙ্গে নিতে চাইছেন প্রহ্লাদ এবং তাঁর তৈরী রোবট বিধুশেখরকে। ৬ই জানুয়ারির ডায়রিতে আছে একটা মজার আবিষ্কারের কথা এবং তার প্রয়োগের কথা। সেই আবিস্কারটি হল হাইতোলা বড়ি। এটির কথা নাকি তার মহাভারতের জৃম্ভনাস্ত্র (জৃম্ভন = হাইতোলা) থেকে মাথায় এসেছিল । একটি বড়ি খেলে হাই তো উঠবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে গভির ঘুম এবং অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখবে । এটি অবিনাশ বাবুর ওপর প্রয়োগ করা হয়। ৮ই জানুয়ারীর লেখা থেকে জানা যায় যে প্রোফেসর শঙ্কু মনোস্থির করেছেন মহাকাশ যাত্রার জন্য তিনি সঙ্গে পাষ্য বেড়াল নিউটনকে সঙ্গে নেবেন। নিউটনের খাবার আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি। সেটি Fish Pill। সেটি খেয়ে নিউটন মহাখুশি।

১০ই জানুয়ারীর লেখাতে বিধুশেখরের কথা আছে। ও আসলে প্রোফেসের শঙ্কুর তৈরী রোবট। এখানে দেখা যায় বিধুশেখর প্রোফেসরের ভুল এক্সপেরিমেন্টের বিরুদ্ধে গাঁ গাঁ শব্দ করে এবং দু' দিকে মাথা নেড়ে বোঝানোর চেষ্তা করে ভুল এক্ষপেরিমেন্ট হ'তে চলেছে ল এবার যখন সার্বিক এক্ষপেরিমেন্টের জন্য প্রোফেসর সার্বিক উপাদান নেন তখন বিধুশেখর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১১ই জানুয়ারী। প্রোফেসর শঙ্কু বিধুশেখরকে ভালো করে পরীক্ষা করেও আওয়াজ করার যথাযথ কারণ খুঁজে পেলেন না। বিধুশেখরের মানবের মতো আচরনকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে-

> "আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধুই দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোনও অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারিনা। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিক দের শুনেছি এরকম হয়।"

এরপর প্রফেসর ব্যাখ্যা করেন বহির্জগত তথা মহাকাশের প্রতি আকর্ষন কবে থেকে কিভাবে তৈরী হ'ল। এও এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। বারো বছর আগের এক রাত্রে প্রোফেসর খাওয়া দাওয়া সেরে তাঁর বাগানেআরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলেন। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস জুড়েই তিনি এভাবে আকাশ দেখেন কারণ এসময়ই সবচেয়ে বেশি উল্কাপাত হয়। সেদিও তিনি অভ্যেস মতো আকাশ দেখছিলেন। হঠাৎ একটা উল্কা দেখা গেল কগরমকশ বড় হয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিল। ক্রমে উল্কাটা কাছে এসে বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকান্ড জোনাকির মত জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। প্রোফেসর শঙ্কু উল্কাটাকে ভালো করে দেখবেন বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই তাঁর ঘুমটা ভেঙে গেল। এটা ঠিক স্বপ্ন দেখছিলেন তা বলা যাবে না কারন তারপর থেকে গোলঞ্চ গাছটাতে আর গোলঞ্চ গাছটাতে গোলঞ্চ না হয়ে এক নতুন ধরনের ফুল হচ্ছে। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনের বেলা কুচকুচে কালো কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জগবলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোললে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

১২ইজানুয়ারীর ডায়রিতে লেখা পর দিন ভোর পাঁচটায় প্রোফেসর শঙ্কু মঙ্গল যাত্রা করবেন। তার প্রস্তুতি চলছে প্রহ্লাদ, নিউটনের পোষাক গায়ে ঠিক হচ্ছে কিনা তা দেখা হচ্ছে।

২১শে জানুয়ারির লেখা ডায়রি থেকে প্রকৃত অর্থে ব্যোমযাত্রার কথা শুরু। পাঠক এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান পান। এখানে প্রোফেসর শঙ্কুর 'বটিকা-ইন্ডিকা'র কথা জানা

যায়। বটফলের রসজাত এই হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘন্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। এই 'বটিকা-ইন্ডিকা' তাদের সঙ্গে আছে একমন। নিউটন মন দিয়ে মহাকাশ দেখে। কুচকুচে কালো আকাশ তার মধ্যে অগনিত জ্বলন্ত গ্রহনক্ষত্র। বিধুশেখর চুপচাপ বসে থাকে। এদিকে প্রলাদ কেবল রামায়ন পাঠেই ব্যস্ত।

২৫শে জানুয়ারীর পর আর ডায়রিতে কোন তারিখ নেই। আছে ঘটনার ঘনঘটা। প্রোফেসর বিধুশেখরকে বাংলা শেখায়। ক্রমশ তারা মঙ্গল গ্রহের দিকে চলেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা মঙ্গলের মাটি স্পর্শ করবে। দেখতে দেখতে তাঁরা মঙ্গলে নামল। সেখানকার পাথর, মাটি, গাছপালা সবই নরম রবারের মতো। নদীর জল স্বচ্ছ পেয়ারার জেলির মত। গছপালাক সব নীল। ঠান্ডা নেই। কিছুটা গরম আছে। তবে মাঝে মাঝে ভয়ানক ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। জল খেতে খুব সুস্বাদু। এরপর মঙ্গলে এক অদ্ভুত দর্শন প্রানীর দেখা মেলে। সেআ মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু এই তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় প্রায় তিন হাত, পা আছে, হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্ডহীন হাঁ, ঠিক মাঝে একটা প্রকান্ড সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মকতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে। বিধুশেখর ঐ জন্তুটিকে এক থাপপড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর দেখা যায় হাজার হাজার ঐ জন্তুরা এগিয়ে আসছে প্রোফেসরদের দিকে। কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। যাত্র শুরু করে অজানার উদ্দেশ্যে। প্রোফেসর শঙ্কু জানান-

> "আকাশভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই। তদের গায়ের সব গহ্বরেদর ভিতর থেকে অগ্ন্যুদ্গার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি।"

এভাবে চলতেচলতে তাঁরা 'টাফা' নামক কোন নতুন গ্রহে এসে পৌছেছে। এই 'টাফা' পৃথিবীর তুলনায় অনুন্নত। রকেট থেকে নামতেই বহুলোক প্রফেসরকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। এদের চেহারার বর্ণনা প্রোফেসর যেমন দিয়েছেন-

> "অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত, পা সরু যেনন কোন কাজেই লাগে না।"

এখানেই প্রোফেসর শঙ্কু সহ বাকীরা দিব্যি থেকে যান। আর পৃথিবীতে তাদের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ফেরার তাগিদ লক্ষ্য করা যায় না। তবে এখানকার লোকজন বাংলা জানে বলে প্রোফেসর শঙ্কুর অনেক সুবিধা হয়েছে।

(১.২) 'ব্যোমযাত্রর ডায়রি' কি জাতীয় রচনা? ডায়রি, কল্পবিজ্ঞান নাকি গল্প?

'ব্যোমযাত্রীর ডয়রি' সূচনা হয় একটি বৈঠক ঢঙে। লেখক তারকবাবু কাছথেকে কিজভাবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি সংগ্রহ করলেন। ডায়রির চরিত্রটি কেমন ছিল এসব বর্ণনা করেছেন। ডায়রি সম্বন্ধে যা লেখা আমাদের যা জানান তাতেই আমাদের, পাঠকের আগ্রহ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে। তারপর তো শুরু হয় ডায়রির লেখা। এখানে একটি জিনিস বুঝতে হবে, ডায়রির আসলে কি ধরনের সাহিত্য কর্ম, এর বৈশিষ্ট্য কি?

ক. ডায়রি হল দিনলিপি। একজন মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের খঁটিনাটি কিম্বা গুরুত্বপূর্ন ঘটনাগুলো রসগ্রাহী করে নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে লেখেন।

খ. দিনলিপিতে দিনের কথা থাকে। অর্থাৎ সন, তারিখ উল্লেখ থাকে।

গ. যেহেতু লেখকের ব্যাক্তিজীবনের কথা এখানে মুখ্য উপজীব্য তাই লেখক এখাননে উত্তম পুরুষেই নিজের কথা বলেন।

ঘ. দিনলিপির ভাষা তুলনামূলক ভাবে কথ্যভাষার অনুসারী। নিত্যদিনকার ব্যবহারের ভাষাই এখানে প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ঙ. লেখক ঘটনাকে এমন ভাবে তুলে ধরেন যাতে মনে হয় পাঠকের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলেছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে দেখলে বলা যায় এটি ডয়রি। এখানে যেমন প্রোফেসর শঙ্কুর গুরুত্বপূর্ন আবিষ্কারের কথা আছে তেমনি অবিনাশ বাবুর মুলোর ক্ষত্র নষ্ট করার জন্য পাঁচশো টাকা জরিমানা দেওয়ার মতো সাধারন ঘটনাও স্থান পেয়েছে। কিম্বা মহাকাশে যাত্রার আগে বিধুশেখর প্রহ্লাদের পোষাক দেখে কেমন ভাবে হাততালি দিয়ে হেসেছে সে কথাও বাদ যায় নি। অর্থাৎ খঁটিনাটি প্রত্যোহিকীর কথা এখানে আছে। এরই পাশাপশি সরল বাক্যে। মুখের ভাষায় যেন একটা নিপুন ছবি এঁকেছেন। একটা উদাহরণ-

"কাছে গিয়ে দেখি কোনও গোলমাল নেই। কলকব্জা তেলটেল সবই

ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার ঘটাং ঘটাং।"

টিপ্পনী

বোঝাই যাচ্ছে নিত্যদিনের ব্যবহারের ভাষায় কি সুন্দর বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। আর একটি বিষয় হ'ল, সাল তারিখ এখানে কোন সালের উল্লেখ না থাকলেও তারিখের হিসেব প্রায় ঠিক ঠিকই আছে। মহাকাশে যাওয়ার পর প্রোফেসর শঙ্কুর তারিখের হিসেব গুলিয়ে যায়। তবে যতদিন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়ে, ততদিন পর্যন্ত এই তারিখ দেওয়া হয়েছে। কাজেই সবমিলিয়ে এর বলার রীতি, লেখা, উপস্থাপন সবই ডায়রির মতো। সর্বোপরি, লেখক সত্যজিৎ রায় এর নামকরনেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এটি সত্যি সত্যিই ব্যোমযাত্রীর ডায়রি।

তবে এই ডায়রির মধ্যে হাত ধরাধরি করে চলেছে কল্পনা বিজ্ঞানের কল্পনা। সেই কল্পনাকে মনে হবে বাস্তবের চেয়ে অধিকতর বাস্তব, সত্য। কল্পনা বিজ্ঞানের ধর্মই তাই কল্পনা করা হবে, বিজ্ঞাননের ওপর ভর করে। লেখক তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী গুনে সেই কল্পনার সত্যকে পাঠক মনে সঞ্চারিত করবে।

এ গল্পেও আমরা প্রোএসর শঙ্কুর নানন এক্সপেরিমেন্টের পরিচয় পাই। যেমন নস্যাস্ত্র বা Snuff-gun', 'Fish Pill' বটিকা ইন্ডিকা, বিধুশেখর। এমন কি যে রকেট করে উনি মহাকাশে পাড়ি দিতে চান সেই রকেটটা বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরী করতে হবে। সেই ধাতুও তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন -

> "অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার পর, ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কম্পাউন্ড তৈরী করেছি, এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, না-হয় একুইয়সভভ ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিষটা পেয়ে যাব।"

এই বর্ণনা পড়ে পাঠকের মনে কোন সন্দেহ তৈরী হয় না যে এটা একটা কাল্পনিক ভাবকনা মাত্র। এরপর যখন মঙ্গলের প্রকৃতি কিম্বা জন্তুর বর্ণনা করা হয় তখন তো সত্যিই যেন পাঠক নিজেই চ লে গেছেন সেখানে এবং সবটা খুব স্পষ্ট দেখতে পান। এরপর মহাকাশে একের পর এক চাঁদ-তারা-নক্ষত্র-উল্কাপিন্ড পাথর পেরিয়ে যখন রকেট টাফার দিকে সে বর্ণনা অতি চমৎকার। যেন পাঠকও প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে মহাবিশ্বে ভ্রমণরত।

এই সব বর্ণনা কল্পনা আর বাস্তবের সমকস্ত ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। অনেক

টিপ্পনী

সত্যমূলকতার জন্মদেয়। কাজেই এটি রোমাঞ্চকর, চিত্তাকর্ষক কল্পবিজ্ঞনের গল্প। গল্প বলা যেতে পারে এই কারনে এখানে ডায়রিধর্মীতা থাকলেও তারই মধ্যে একটি নিটোল গল্পের স্বাদ মেলে। ছোটগল্পে যেন টানটান রচনাভঙ্গি থাকে, এখানেও তেমন। যেমন আছে একমুখীনতা, তেমনি আছে গতিময়তা। নিটোল বৃত্ত। সব মিলিয়ে বলা যায় এটি ডায়রি ধর্মী কল্পবিজ্ঞন মূলক গল্প। এবং নামকরন ও. বিষয়কেন্দ্রিক যথাযথ হয় হয়েছে।

(২) স্বপ্নদ্বীপ: এক নিবিড় অনুসনন্ধান

এই গল্পির বিষয় ভারি চমকপ্রদ। স্বপ্ন আর কল্পনার মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে একধরনের সাহিত্যের সত্য। এই গল্পটিরকাহিনী রহস্য - রোমান্সে পরিপূর্ন। একটা ফ্যান্টাসীর জগত তৈরী হয়েছে। লেখকের কল্পনার নৈপুন্য আবার প্রমানিত হয়েছে এ লেখায়।

এই গল্পটির নাম 'স্বপ্নদ্বীপ'। এই ডায়রিটি লেখা শুরু হয়েছে ২২শে মার্চ। শেষ হয়েছে ৭ই জুলাই। মাঝখানে অবশ্য ডায়রির একটা অংশ অবিনাশ বাবুর লেখা। সেটাও গল্পের কৌশলগত কারনেই। এ গল্পের বিষয় এত গতিময় ও প্রানবন্ত যে পাঠক পড়তে পড়তে সত্যি সত্যি স্বপ্নজগতে বিচরন করেন। গল্পের শুরু হয়েছে প্রোফেসর শঙ্কুর এক আশ্চর্য স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে, তিনি যে স্বপ্নটি দেখেছেন তা এইরকম-

> "দেখলাম আমি একটা শদ্ভুত জায়গায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে ঘরবাড়ি লোকজন কিছুই নেই - আছে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল। এইসব গাছপালার একটিও আমর চেনা নয়। আদের রং ও ভারী অস্বাভাবিক। সবুজ পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে নিল লাল বেগুনী কমলা এই ধরনের রং। গাছে ফুল আর ফলও আছে - তার একটাও আমার চেনা নয়। একটা প্রকান্ড ফুলে অজস্র পাপড়ো আর প্রত্যেকটা পাপড়ির রং আলাদা। আর একটা ফুলের এক একটা পাপড়ি যেন এক একটা হাতির কান, আর হাতির কানের মতোই সেগুলো মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। ফলও যে কত রকমের রয়েছে, তার ঠিক নেই। একটা প্রকান্ড গাছে সরু সরু নীল রঙের ফল বটগাছের শিকড়ের মতো মাটিতে গিয়ে নেমেছে। আর একটা তরমুজের সাইজের ফল - তার সর্বাঙ্গে গাঢ় লাল রোঁয়া, আর সেই রোঁয়ার ভিতর দুটো করে গোল গোল সাদার মাঝখানে কালো ফুটকি। ঠিক যেন মনে হয় ফলের গায়ে এক জোড়া চোখ।"

টিপ্পনী

এই স্বপ্নের ঘোর বেশিক্ষন থাকল না। কিছুক্ষনের মধ্যেই প্রোফেসর শঙ্কু বাস্তবে ফিরে এলেন। এখন তিনি অ্যান্টি - গ্র্যাভিটি নিয়ে গবেষনা করছেন। সেই বিষয়ে তিনি জানান যে তিনি এমন একটি ধাতু তৈরী করবেন যা মধ্যাকর্ষন শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম। সেটি তৈরী হয়ে গেলে, তা দিয়ে একটি আকাশ যান তৈরী করবেন। এরপর ২৫শে মার্চের ডায়রি থেকে জানা যায় তিনি ঐ ধাতুটি তৈরী করে ফেলেকছেন যার নাম দিয়েছেন 'শ্যাঙ্কোভাইট'। এই ধাতু দিয়ে তৈরী প্লেনটির নাম দিলেন শ্যাঙ্কোপ্লেন। ২৬শে মার্চ অবিনাশ বাবুর কছে খবরের কাগজ পড়ে প্রোফেসর শঙ্কু জানতে পারেন যে ইউরোপের সাতজন স্বনামধন্য মনীষী একজোটে উধাও কহয়েছেন। এঁরা সকলেই ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে একটা আন্তর্জাতিক মনিষী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সাতজনেই একই দিনে একই সময়ে অদৃশ্য হয়েছেন। এই সম্মেলনে প্রোফেসর শঙ্কুও নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি শ্যাঙ্কোভাইট নিয়ে খুবই ব্যাস্ত ছিলেন। উল্লেখ ঐ পূর্বোক্ত স্বপ্নটি তিনি আবার দেখেছেন। আগের চাইতে আরো কিছু নতুন তথ্য জানা গেল এবারের স্বপ্নে -

> " এই সব রং চঙে গাছপালার মধ্যে একটির গুঁড়িতে একটি গর্ত - যেমন অনেক বুড়ো বট - অশ্বত্থের গায়ে থাকে। সেই গর্ত দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর গলার স্বরে কে যেন বলে চলেছে ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান থার্টি সিক্স ইষ্ট .... ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিছিউড ওয়ান - থার্টি - সিক্স ইস্ট.....।"

পাঁচদিন পরপর এই স্বপ্ন দেখার ফলে প্রোফেসর শঙ্কুর ঐ দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশে অঞ্চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হ'ল।

২রা এপ্রিল প্রোফেসর শঙ্কু লিখেছেন যে গত পরশু সকালে অবিনাশ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাঙ্কোপ্লেনে করে তারা গিরিড় থেকে রওনা হয়েছেন। দুটো বয়ামে দুমাসের মতো 'বটিকা -ইন্ডিকা' নেওয়া হয়েছে। তেষ্টা মেটানোর জন্য 'তৃষ্ণানাশক' বড়ি। আর টি-পিলস ও কফি পিলস আছে। সেই বিউশেষ আকাশযান সুন্দরবনের ওপর দিয়ে আন্দামান নিকোবর পেরিয়ে এগিয়ে চলল প্রোফেসরের স্বপ্নে দেখা 'ফ্লোরোনা দ্বিপ' এ। মাঝখানে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলের নির্জন জায়গায় নেমে খানিক বিশ্রাম করে নেন তারা। সেখান ধেকে সঙ্গে নেন অলস প্রকৃতির বাঁদর 'স্লো লরিস'। অবিনাশবাবু ওর নাম দিল টিমু। এটা ৪ঠা এপ্রিলের বর্ণানা। এরপর ৫ই এপ্রিল, সকাল আটটার লেখা থেকে জানা যায়, তাঁরা ক্রমশ স্বপ্নের সেই দ্বীপে পৌঁচোছে। ঐ দিন সকাল সাড়ে নটার লেখা থেকে জানা যায় তারা

টিপ্পনী

দশ মিনিট আগেই ল্যান্ড করেছে সেই দ্বীপে। এখানকার মাটি বালির চেয়ে বেশ কয়েকগুন বড় লাল আর নীল রঙের দানা দিয়ে তৈরী। তা খুব ভারীও বটে। এখানকার গাছপালা গুলো ও ভারি অদ্ভুত রঙের। সব রঙের মধ্যে যেন একটা কালোর ছোপ পড়েছে, ডালপালা কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে, গাছ নুইয়ে পড়েছে, ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তবে দ্বীপের অন্যদিকটায় রঙের ছড়াছড়ি। প্রোফেসর এবার সেদিকটায় গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাই লিখলেন -

> "এদিকটায় এসেছি। বড় অলস লাগছে। চারদিকে রং। স্বপ্নের সব কিছুই একানে। আরেক অদ্ভুত ঘটনা। সেই হারানো সাতজনই সবাই এখানে। কী হয়েছে তাঁদের জানি না। সবাই বসে আচেন হাত পা ছড়িয়ে। সবাই যেন খোকা। সবাই যেন বোকা ল খালি হা হা করে আসেন। আর কি লিখি। আর কিছুই নেই লেখার। আমায় ডাকছে বোধ হয়। হ্যাঁ, আমায় ডাকছে, যাই আমি।"

এরপর ঘটল তা লেখার মত অবস্থায় প্রোফেসর শঙ্কু ছিলেন না। সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন অবিনাশ বাবু ৫ই এপ্রিল, রাত আড়াইটায়। তিনি জানা সেখানে ঐ সাতজন মনীষীর কথা। কেউ জুতো হাতে বসে হাসছেন, কেউ তাঁর মানিব্যাগ থেকে রুপোর মুদ্রা বার করে সমুদ্রের জলে ফেলছেন, কেউ বা ডিগবাজি খাচ্ছেন, কেউ কেউ ঘুমোচ্ছেন। এদিকে বিরাটাকার একটি ফুল শঙ্কুমহাশয়ের মাথাকে আচ্ছাদিত করল। কিছুক্ষন পর আবার স্বাভাবিক হল। তারপর ফুলের রঙ অনেক উজ্জ্বল হল। এরপর গোটা দ্বীপটা আন্দোলিত হতে থাকল। জলে ডুবে যেতে থাকল সমগ্র দ্বীপ।

এর পরের ঘটনা আরো আশ্চর্যের। প্রায় মাস তিনেক পরের লেখা। ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় আর একটি লেখা পড়ে সত্যিই চমক যেতে হয়। একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু পন্ডিত মানুষ একই সময় একসাথে ঐ এক স্বপ্ন দেখেছেন। ঐ স্বপ্ন দেখে সবাই একসাথে ঐ দ্বীপে ছুটে গেছেন। আরো অনেক পন্ডিত স্বপ্ন দেখে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা এখানে এসে উঠতে পারেনি। এদিকে অবিনাশবাবু সঙ্গে করে ঐ বিশেষ ফুলের পাপড়ির খানিকটা অংশ সঙ্গে করে এনেছিলেন। প্রোফেসর শঙ্কু তা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জানতে পারেন -

> "এই পাপড়ির সঙ্গে পৃথিবীর কোনও ফুলের কোনও পাপড়ির কোনও মিল নেই। এই পাপড়ির অ্যানাটমি অবিশ্বাস্য রকম ঝটিল ; প্রায় একজন

মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে ধরনের জটিলতা থাকে, এতেও তাই।"

টিপ্পনী

অবিনাশ বাবুর বর্ণনা থেকে প্রোফেসর আরো অনুমান করেন যে, ঐ ফ্লোরোনা দ্বীপের গাছপালার খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, যে জ্ঞান তারা শুষে নেয় পন্ডিত মব্যাক্তিওদের মস্তষ্ক থেকে। শুধু তাই নয়, তেমন ভাবে ক্ষুধার্ত হলে এরা উর্বরমস্তিষ্ক লোকদের স্বপ্ন দেখিয়ে আকর্ষন করে নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। আর এই ফ্লোরোনা কোন দ্বীপ কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কোন সৌরজগৎ থেকে ছিটকে আসা গ্রহ বা গ্রহের অংশ হতে পারে বলে মনে করছেন প্রোফেসর শঙ্কু। এমনকী, অন্যগ্রহ থেকে আসা একটা রকেট জাতীয় ও কিছু হতে পারে। হঠাৎই পাপড়িটা যেন ক্ষীন বিদ্রুপ হাসি হেসে ওঠে। প্রোফেসর শঙ্কু অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা এই পাপড়িটাকে তাক করে চালায়। পাপড়িটা ধ্বংস হয়। গল্প এখানে শেষ হয়।

এই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরী করা হয়েছে। পরতে পরতে নতুনত্বের চমক, এক স্বপ্নময়তার আবেশ তৈরী করা হয়েছে গল্পে। প্রোফেসর শঙ্কু এ গল্পে স্বপ্নে দেখে সেই দ্বীপে হাজির হয়েছেন। আর পাঠক দ্বীপের কান্ড কারখানায় স্বপ্নবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এই গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি দিয়ে অদ্ভুতকে, কল্পনাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেদিক থেকে গল্পের বাঁধুনি ও শক্ত।

(৩) একশৃঙ্গ অভিযান

'একশৃঙ্গ অভিযান' সত্যিই একটি অভিযানের গল্প। রোমহর্ষক সে অভিযান। এই গল্পের পটভূমিকা তিব্বত। এর অন্যতম আকর্ষন তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যথারীতি উৎকন্ঠা, অজানার আশঙ্কা ও কৌতুহল, রহস্যময়তা - এগল্পোও একটি বর্ণনা দিয়েছে। এ গল্পের আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল - একটি মায়ার জগৎ তৈরী হয়েছে এখানে আর তাতেই পাঠক বুঁদ হয়ে থাকেন।

অন্যান্য গল্পগুলির তুলনায় এখানে রচনা কৌশল একটা নতুনত্ব আনা হয়েছে। এখানে ডায়রির মধ্যে ডায়রির কথা বলা হয়েছে। তিব্বত পর্যটক চার্লস উইলার্ডের একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। সেই ডায়রিতে সব আশ্চর্য ঘটনার বিবরন দেওয়া আছে। সেই ডায়রি এখন প্রোফেসর শঙ্কুর ইংল্যান্ডের ভূতত্ত্ববিদ বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের কাছে আছে। শঙ্কু মহাশয়ের তিব্বত সম্বন্ধে প্রচন্ড কৌতুহল এবং তিনি তিব্বতি ভাষাটা জানেন বলে সন্ডার্স তাঁকে চিঠি লিখে এ বিষয়ে জানায়।

টিপ্পনী

উইলার্ডের ডায়রির সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিক হল তিনি নাকি 'ইউনিকর্ন' দেখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে এই 'ইউনিকর্ন' নামক প্রানীটিকে আবহমানকাল থেকেই সারা বিশ্বের লোকে কাল্পনিক প্রানী বলেই জানে। এটি একশৃঙ্গ জানোয়ার। কপাল থেকে বেরোনো লম্বা প্যাঁচানো শিং বিশিষ্ট ঘোড়া। তবে প্রোফেসর শঙ্কু এই জন্তুটিকে কাল্পনিক বলতে নারাজ। তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে -

> "এ জানোয়ার যে কাল্পনিক নয় সেটা ভাবার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে দুহাজার বছর আগের রোমান পন্ডিত প্লকিনি তাঁর বিখ্যাত জীবতত্ত্বের বইয়েতে স্পষ্ট বলে গেছেন যে, ভারতবর্ষে একরকম গোরু আর একরকম গাধা পাওয়া যায় যাদের মাথায় মাত্র একটা শিং। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটলও ভারতবর্ষে ইউনিকর্ন আছে বলে লিখে গেছেন। এ থেকে কি এমন ভাবা অন্যায় হবে যে, এককালে এদেশে এক ধরনের একশৃঙ্গ জানোয়ার ছিল যেটা এখান থেকে লোপ পেলেও, হয়তো তিব্বতের কোনও অজ্ঞাত অঞ্চলে রয়ে গেছে, আর উইলার্দ ঘটননাচক্রে সেই অঞ্চলে গিয়ে পড়ে এই জানোয়ার দেখতে পেয়েছেন?"

এই সমস্ত যুক্তির কথা বন্ধু সান্ডার্সকে পাঠালে সান্ডার্স আরো জানা যে উইলার্ড নাকি দুশো বছরের প্রাচীন লামার সাথে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উইলার্ড তিব্বত থেকে ফেদরার সময় খামপা শ্রেনীর একদল দস্যু তার সর্বস্ব লুট করে এবং তাকে জখম করে। কোনক্রমে ভারতবর্ষে এলে পরে তার মৃত্যু হয়।

স্থির হল সবাই মিলে তিব্বত অভিযানে বেরোবেন। এদিক থেকে প্রোফেসর শঙ্কু ও অবিনাশবাবু আর ইউরোপ থেকে সন্ডার্স ও ক্রোল। রাস্তায় আরও একজন বিদেশী তাঁদের সঙ্গ নিয়েছেন তিনি সের্গেই মার্কোভিচ। এই লোকটাকে ক্রোলেকর খুব একটা পচ্ছন্দ নয়। সবাই মিলে ভুটানে প্রবেশ করে সেকানে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। কিছু মানুষকে ইউনিকর্ন এবং উড়ন্ত লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কোন ফল হল না। আদৌ তারা উইলার্ডের মত এসব দেখতে পাবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবে উইলআর্ডের ১১ই মার্চের ডায়রিতে একটা বিশেষ জায়গার উল্লেখ আছে যার নাম দেওয়া নেই। তবে ভৌগলিক অবস্থান দেওয়া আছে। সেটা হল ল্যাটিচিউড ৩৩.৩ নর্থ আর লঙ্গিছিউড ৮৪ ইষ্ট। ম্যাপ খুলে দেখা গেল সেটা কৈলাসের প্রায় একশো মাইল উত্তর - পশ্চিমে চাংথাং অঞ্চলে।

৪ঠা আগষ্ট তারা পুরাং উপত্যকায় এসে হাজির হল। সেখানে মার্কোভিচের অক্সিজেনের অভাব হওয়ায় পাগলের মত আচরন করছে। এই পুরাং এ এক বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। একদল দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল শঙ্কু মহাশয়ারা। প্রোফেসরের অ্যানাইহিলিন পিস্তলের গুনে সে যাত্রায় তাঁরা রক্ষা পান। এই দস্যুদলই উইলার্ডকলে জখম করে সবলুট করেছিল। সে সবই আবার তারা ফিরে পেল ঐ দস্যুদের কাছ থেকে। মার্কোভিচ যে ড্রাগের নেশায় মত্ত থাকে তা জানা গেল এখানে। তার সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারনা তৈরী হল সকলের।

৭ই আগষ্টের লেখা থেকে জানা গেছে ভ্রমনকারী দলটি সাংচান ছাড়িয়ে এসেছে। এখন তারা একটি তিব্বতি মঠ বা গুম্ফায় বিশ্রামক করছে। তবে এখনো পর্যন্ত একশৃঙ্গের কোন সন্ধান মেলেনি। তবে মধ্যে এক লামার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এই লামা পঞ্চাশ বছর কোন কথা বলেন নি। আকার ইঙ্গিতে, ঘাড় নেড়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। তার কাছে একশৃঙ্গ দর্শন প্রাপ্তির কথা জানতে চাইলে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়, আবার পরে না জানায়। উড়ন্ত লামা সম্পর্কে জানা যে, সেরকম একজনই ছিলেন। এখন কেই নেই।

এদিকে প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযাত্রী দলটি মানস সরোবরের উত্তর পশ্চিমে একটা জলকুন্ডে এসে পৌঁছলো। এখানে এসেই ক্রোলল বুঝতে পারে সার্কোভিচ আসলে খুনের আসামী। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে কথা তখনই তাকে বুঝতে দেওয়া হল না। এরপর তারা সত্যি সত্যি এসে হাজির হ'ল মানস সরোবরে। তার প্রাকৃতিক শোভা অপুর্ব। শঙ্কুর জবানীতে লেখক বলেছেন-

> "চারিদিকের বালি আর পাথরের রুক্ষতার মধ্যে এই পঁয়তাল্লিশ মাইল ব্যাসযুক্ত জলখন্ডনের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ নীল রং মনে এমনই একটা ভাবের সঞ্চার করে যার কোন বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্রদের উত্তরে বাইশ হাজার ফুট উঁচু কৈলাস, আর দক্ষিনে প্রায় যেন জল থেকে খাড়া হয়ে ওঠা গুর্লা - মান্ধাতা।"

এখান থেকে তাঁরা যাত্রে শুরু করলেন ল্যাটিছিউড ৩৩.৩ নর্থ ও লাঙ্গচিউড ৮৪ ইস্ট এর দিকে। ক্রমে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলো ল্যাটিচিউড ৩২.৫ নর্থ এবং ৮২ ইষ্ট এ। এরপর তাঁরা আরো উত্তরে রওনা হল। সেখানে ডুংলুং ডো আছে। এই ডুংলুং ডো হল অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। এর পেছনে কি আছে কেউ জানে না।

১৯শে আগষ্ট। প্রোফেসর শঙ্কু জানানচ্ছেন তারা একটা গুম্ফায় পৌঁছোলেন,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সেখানে কেউ নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে চোখে পড়ল এক মৃত লামা। বই পড়ার ভঙ্গিতে বসে আছে ল মৃত লামার হাতে একটা পুঁথি ছিল সেটি কোনক্রমে প্রোফেসর শঙ্কু নিয়ে পড়ে দেখলেন যে সেটি চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি পুঁথি। এই পুঁথি পড়ে এক আশ্চর্য পদার্থের কথা জানা যায়, যার নাম 'সুৎ'। এই 'মুং' এর সাআয্যে মানুষের ওজন এতটাই কমিয়ে দেওয়া যায় যে একটা দমকা বাতাসে মানুষ মূন্য এ ভেসে বেড়াতে পারে। এই 'মুং' বানাতে প্রয়োজন হয় বলীক, ষলক্র, ত্রিগন্ধা, অভ্রনীল, থূমা, জটা। এর কোনটিকেই প্রোফেসর শঙ্কু চেনেন না। তবে প্রোফেসর শঙ্কু এটা অনুমান করেছিলেন যে এই মৃত লামাই সেই 'টু হান্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা' যাঁর সঙ্গে উইলার্ড ওই 'মুং' এর সাহায্যেই আকাশে উড়েছিলেন।

২০শে আগষ্ট। পৌঁছোনোও গেল সেই কাঙ্খিত ল্যাটিচিউড ৩৩.৩ নর্থ ও লঙ্গিচিউড ৮৪ ইষ্ট এ। এখানে একধরনের তিব্বতি বুট পাওয়া যায় যেটা পায়ে পারলেই আকাশে ওড়া যায়। প্রোফেসর শঙ্কু সবাইকে তখন 'মুং' এর কথা বলেন। এও বলেন যে ঐ জুতোয় নিশ্চয়ই 'মুং' এর প্রলেপ দেওয়া আছে। এই জুতো পরে সবাই ঐ ডুংলু' ডো পেরিয়ে গিয়ে পড়ল এক স্বপ্ন রাজ্যে। সেখানকার গাছপালা, প্রকৃতি সম্পূর্ন আলাদা। সবাই উত্তজিত। হঠাৎ দেখা মিলল 'ইউনিকর্ন' এর। শঙ্কুর র্ণনাযায়ী-

> "তাদের গায়ের রং গোলাপি আর খয়েরি মেশানো। গোরু আর ঘোড়া - এই দুটো প্রানীর সঙ্গেই তাদের চেহারার মিল রয়েছে, আর রয়েছে প্রত্যেকটার কপালে একটা করে প্যাঁচানো শিং।"

এদিকে মার্কোইচ এক কান্ড করে বসে। সে একটি ইউনিকর্ন নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে সেখান থেকে ইউনিকর্ন নিয়ে যেতে পারে না সে। প্রাচীরের দেড়শো ফুট নিচে পরে সে মারা যায়। আর ইউনিকর্নটিও তার হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইউনিকর্নটি কিন্তু তার সঙ্গে পড়ে নি।

গল্পের শেষে ডুংলুং ডো সম্পর্কে সবাই মোটামুটি একমত। প্রোফেসর শঙ্কু জানান-

> "আমার মতো অনেক দেশের অনেক লোক অনেক কাল ধরে যদি এমন একটা জিনিস বিশ্বাস করে যেটা আসলে কাল্পনিক, তা হলে সেই বিশ্বাসের জোরেই একদিন সে কল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারে। এইভাবে বাস্তব রূপ পাওয়া কল্পনার জগৎ হল ডুংলুং-ডো। হয়তো এমন জগৎ

পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ডংলুং-ডো র কোনও প্রানী বা উদ্ভিদকে তার গন্ডির বাইরে আনা মানেই তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা, মার্কোভিচ তাই ইউনিকর্ন আনতে পারেনি, সন্ডার্সের থলি থেকে তার সংগ্রহ করা ফুলপাতা তাই উধাও হয়ে গেছে।"

টিপ্পনী

এই কৈফিয়ৎ টুকু না দিলে সাহিত্যের সত্যতা রক্ষা পেত না। এই গল্পটি যে কাল্পনিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন পাঠক এর ভিতর ক্রমশ প্রবেশ করবে তখন আর এক অন্যতর সত্যের সন্ধান করবে সে। সে সত্য মনোজগতের সত্য। বাস্তবের সঙ্গে তার হয়তো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু চিত্তে তো তা বাস্তব, সত্য। তাই এই উপসংহার। এতক্ষন ধরে যে রহস্য জগৎ নির্মিত হয়েছে, তা এক নিমেষে যাতে ভেঙে না কযায় সেই জন্যই এ কৈফিয়ৎ। এরপর কিন্তু আর আমাদের মেনে নিতে অসুবিধে হয় না যে। প্রোফেসর শঙ্কু, অবিনাশ বাবু কিম্বা সন্ডার্সের বয়স কমে গেছে। সবমিলিয়নে এক অসাধারন অভিযান। এই অভিযানের আর একটি বড় দিক হল প্রোফেসর শঙ্কুদের সাথে পাঠক বর্গও গোটা তিব্বত তথা ডুংলুং-ডো ঘুরে এলেন। তাদের হর্ষ বিষাদ উৎকন্ঠার সাক্ষি রইলেন।

(৪) শঙ্কুর শনির দশা

এই গল্পটি রীতিমতো গোয়েন্দা গল্পের আদলে লেখা। গল্পটিতে আগের গল্পগুলির মতো একটা স্বপ্নালুতা নেই, কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর তাবলা যায়। প্রোফেসর শঙ্কু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। কাজেই তাঁর অনুগামী বা অনুরক্ত মানুষ যেমন পৃথীবি জুড়ে, তেমনি তাঁর শত্রুরও অভাব নেই। 'শঙ্কুর শনির দশা' গল্পে শঙ্কুর এই বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারই পরিচিত আর এক বিজ্ঞানী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং জগৎসভা তাঁকে অপদস্ত করবার চেষ্টা করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয় না। প্রাথমিক ভাবে এই যে শঙ্কুর ওপর এক গভীর ষড়যন্ত্র সেখান থেকে কিভাবে মুক্ত হবেন শঙ্কু তা বুঝতে না পারা - সেই কারনে নাম হয়েছে "শঙ্কুর শনির দশা"।

এই গল্পটি শুরু হয়েছে ৭ই জুন। একটি হাল্কা কথপোকথোন ভঙ্গিমায় ডায়রিটি শুরু হয়েছে। শঙ্কু কোনদিনই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তিনমাস আগে অবিনাশ বাবুর সঙ্গে আসা এক জ্যোতিষী প্রোফেসর শঙ্কুকে দেখে বলেছিলেন -

"আজ থেকে তিনমাস পরে তোমার চরম সংকটের দিন আসছে। শনির দৃষ্টি পড়বে তোমার উপর। এমনই অবস্থায় পড়বে যে, মনে হবে এর চেয়ে মৃত্যু ও ভালো।

টিপ্পনী

ঘটনাচক্রে এই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

এবার যেন আস্তে আস্তে ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করা গেল। গত দু' মাস আগে ম্যাড্রিড থেকে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য প্রোফেসর শঙ্কু আমন্ত্রন পান। আবার কিছুদিন পর সেই সম্মেলন কতৃপক্ষ সে আমন্ত্রন প্রত্যাহার করে চিঠি পাঠায় শঙ্কুকে। এখানেই জটিলতার সূতরপাত। হঠাৎ কি এমন ঘটল যে কারনে এমন একজন বরেন্য বিজ্ঞনীকে আমন্ত্রন জানিয়েও শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করতে হল?

১০ই জুন ডায়েরি থেকে জানা গেল যে শঙ্কুর ইংরেজ বন্ধু জন সামাভিল শঙ্কুকে একটা চিঠি ও তাঁর সঙ্গে একটি পেপার কাটিং পাঠিয়েছেন আর তাতেই গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হল। বিষয়টা হল গত ১১ই মে অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুক শহরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে এক আলোচনা সভায় প্রোফেসর শঙ্কু নাকি তাঁর বকক্তব্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বৈজ্ঞানিকদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমন ককরেন। এই ঘটনা গোটা বৈজ্ঞানিক মহল তথা সেখানকার জনসাধারনের মনে তুমুল আলোড়ন তৈরী করে। সবচাইতে আশ্চর্যের হল প্রোফেসর শঙ্কু নিজে কোন কালেই ইনস্ব্রুক শহরে যান নি। ফলে এমন বক্তৃতা দেওয়া তাঁর পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল পেপারে তাঁর দেইয়া ছবিটি তো আসল। হুবুহু শঙ্কু। ঐ বক্তব্য শুনে অনেকেই তাঁকে আক্রমন করতে গেলে ডক্টর গ্রোপিয়াস নাকি তাঁকে বাঁচান। এই গ্রোপিয়াসের সঙ্গে শঙ্কুর আলাপ হয়েছিল বাগদাদে।

এদিকে ২১শে জুনের ডায়রিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রোপিয়াস প্রোফেসর শঙ্কুকে চিঠি পাঠান ল তা থেকে শঙ্কু ঘটনার আরো বিস্তারিত বিবরন জানতে পারেন। এটা বুঝতে আর বাকি নেই যে প্রোফেসর শঙ্কুর ডুপ্লিকেট শঙ্কুর এমন বদনাম করেছে। এবার তাঁর মনে পড়ে গেল জ্যোতিষীর কথা। তিনি বলেছিলেন-

> "যে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে সংহার করতে পারলে তবেই মুক্তি।"

সেই শত্রুটি কে? একথা জানতে চাইলে জ্যোতিষী-

> "ভারী রহস্যজনক ভাবে একটু হেসে বললেন, তুমি নিজে।"

এই 'তুমি' তাই হল আসলে শঙ্কুর নকল। সেই এ সমস্ত কান্ড করেছে। তাকে সংহার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে শঙ্কু স্থির করলেন ইনসব্রুকে

যেতে হবে। নকল, প্রতারক শঙ্কু সম্ভবত সেখানেই আত্মগোপন করে রয়েছে সেখানে না গেলে তাকে খুঁজে বার করা যাবে না।

৬ই জুলাই রওনা দিবে ৭ইজুলাই পৌঁছে গেলেন প্রফেসর শঙ্কু। ইতিমধ্যেই সামারভিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ল তিই আসছেন। আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েচিল। তিনি ইনস্ব্রুকের তরুন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। ইনিও ছিলেন ঐ বক্তৃতার সময়। তাঁকে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বাড়ি ছিলেন না চাকর ফোন ধরেছিলেন। যাইহোক ইনস্ব্রুকে প্রথম সাক্ষাৎ হল গ্রোপিয়াসের সঙ্গেতার বাড়িতে। সেখানে গ্রোপিয়াস প্রোফেসর শঙ্কুকে দেখে বলেন যে তার পরীক্ষা করবার জন্য ডক্টর ওয়েবার আসছেন। গ্রোপিয়াস আসলে শঙ্কুকে অসুস্থ প্রমান করতে চান। শঙ্কু বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তাঁরই চেহারার সঙ্গে মেলে এমন কোন লোক নিখুত মেকআপ করে শঙ্কুর বদনাম করতে চায়। কিন্তু গ্রোপিয়াস তা বিশ্বাস করল না। বরং শঙ্কু যে গ্রোপিয়াসকে চিঠি লিখে ঐ সম্মেলনে আসার কথা জানিয়েছে তেমন দুটো চিঠি এনে দাখাল। শঙ্কু স্তম্ভিত। এতো তারই লেখা চিঠি।

এই সমস্ত রহস্যের জাল একটু একটু করে ছিঁড়তে থাকে , যখন শঙ্কুর বন্ধু সামারভিল এল। তিনি এসে প্রথম জানালেন যে গ্রোপিয়াস শঙ্কুর প্রতি ঈর্ষাকাতর। কেননা শঙ্কুর তৈরী অমনিস্কোপ, ধন্বন্তরি ওষুধ, মিরাকিউরল, লিঙ্গুয়াগ্রাফ, এয়ারকন্ডিশনিং পিল- এ সবগুলোই গ্রোপিয়াসের মাথায় এসেছিল কিন্তু তাঁর সামান্য আগেই তুমি এসবের পেটেন্ট নিয়ে রেখোছো। এগুলো সামারভিল গ্রোপিয়াসের লেখা জোগার কিরে পড়ে জেনেছে। এটাও তাদের কথপোকথন থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ঐ চিঠিও নকল করা হয়েছে। এরপর হঠাৎই ফিংকেলস্টাইনের ফোন। তিনি আরো নতুন তথ্য দেন প্রোফেসর শঙ্কুকে। তিনি জানা ঐ বক্তৃতার দিন শঙ্কু বক্তৃতা দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, তখন তার চশমাটি খুলে পড়ে যায়ন। সেটি ফিংকেলস্টাইন সংগ্রহ করে রাখেন। ততার সঙ্গে একটি চুলও ছিঁড়ে থেকে যায়। সেই আসলে নকল চুল। নাইলনের। সেটি দেখেই ফিংকেলসটাইন বোঝেন যে ইনি নকল শঙ্কু। এরপর, পরদিন সকালে শঙ্কু তাঁর বন্ধুকে নিয়ে ফিংকেলস্টাইনের বাড়ি যাবেন বলে কথা হয়।

পরদিন সকালে ফিংকেলস্টাইনের বাড়ির দরজার বেল টিপলে চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে বলেন-

"আসুন ভেতরে..... আপনি কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বোঝাগেল নকল শঙ্কু কিছুক্ষন আগে এসেছিল। ফিংকেলস্টাইনের ঘরে গিয়ে দেখা গেল তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ফিংকেলস্টাইনের সাংকেতিক নোট প্যাড়ের লেখা পড়ে শঙ্কু সেই চশমা ও চুল খুঁজে পেল। সেটা নিয়ে তারা চলে এল। ঘর থেকে নামার সময় নকল শঙ্কুর জুতোর ছাপ দেখা গেল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা হোটেলে ফিরে এলেন।

এদিকে কিছুক্ষন পর এসে গ্রোপিয়াস পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন এসব করেছেন, শঙ্কুকে শাস্তি দেবার জন্য। এবার সব প্রমান হবে যে আসল শঙ্কুই ই হত্যা করেছেন। এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরী করে গ্রোপিয়াস বিদায় নেন। তারপরই পুলিস শঙ্কুকে খুঁজতে হোটেলে আসে। তার আগেই শঙ্কু তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে দুজনে তাদের নিজস্ব অস্ত্র। সামনে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে জোরে চালাতে বলে। পেছনে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। যেতে যেতে হঠাৎ একটা গেরোস্থানের ভেতর একটা কফিন নিয়ে দশ বারোজন লোক ঢুকে পড়ল। তাই দেখে সামারভিল গাড়ি থামাতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গাড়ি এসে সেখানে দাঁড়ায়।

পুলিশ শঙ্কুকে ধরে নিয়ে চলে যাবে এমন সময় সামারভিল তার রিভলবার দিয়ে তিনবার কফিনটাতে গুলি করে। এদিকে কফিনের সঙ্গে আসা গ্রোপিয়াস দৌড়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এখনও বাকী ছিল। গুলি লেগে কফিনের মধ্যে থেকে উঠে বসে শঙ্কুর ডুপ্লিকেট যেটাকে গ্রোপিয়াস তৈরি করেছিল। সেই রোবট এবার সেই পুরনো বিতর্কিত বক্তৃতা দিতে শুরু করে। আসলে এটা রেকর্ড করা ছিল। গুলিতে যন্ত্র বিকল হয়ে এই রেকর্ড বাজতে শুরু করে। এই দেখে প্রোফংসর শঙ্কু খুবই উত্তেজিত। তিনি ডায়রিতে লিখেছেন -

> " আমিজ আমার অ্যানাইহিলিন বন্ধুটিকে পকেট থেকে বার করলাম। আমার এই পৈশাচিক জোড়াটিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে তবেই আমার মুক্তি।"

গল্পটি এভাবে এক আশ্চর্য চমক দিয়ে শেষ হয়। এখানে গল্পটির বৃত্ত নিটোল। রীতিমতো এর শুরু মধ্য অন্ত্য আছে। এই গল্পটি গোয়েন্দা আদলে তৈরী। পড়তে পড়তে পাঠক গুলিয়ে যায় যে পাঠক ফেলুদা পড়ছেন না প্রোফেসর শঙ্কু পড়ছেন। এতে রয়েছে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীদের দ্বন্দ্ব। এসব নিয়ে এক রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের আবার পেয়েছে এই 'শঙ্কুর শনির দশা' তবে এটা খুবই আনন্দের কথা শেষ পর্যন্ত শঙ্কর শনির দশা

কেটে যায়। তিনি এক বিরাট ষড়যন্ত্র থেকে এখন মুক্ত। স্বাধীন, বিপদন্মুক্ত।

টিপ্পনী

(৫) প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও

ইউ. এফ. ও. অর্থাৎ আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট অর্থৎ অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু। এই বস্তুটিকে নিয়ে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে খুব মাতামাতি চলছে। এর মূল কথা হ'ল ভিনগ্রহের প্রানরা হরদম রকেটে করে উড়ে এসে পৃথিবীতে হানা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যদিও এর কিছুই প্রোফেসর শঙ্কুর বিশ্বাস হয় না। এই ইউ. এফ. ও. র কথা মনে হতেই তাঁর মনে পড়ে গেল রোডোল্‌ফো কারবোনির কথা। প্রোফেসর শঙ্কু বছর দশেক আগে পর্যন্ত রেড়িক ও তরঙ্গের সাহায্যে অন্য গ্রহের প্রানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে জেনিভাতে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই ববক্তৃতা পন্ডিত মহলে উচ্চপ্রশংসিত হয়। সেখানকেই এই কারবোনির সঙ্গে দেখা। বক্তৃঐতা শেষে কারবোনি নিজেই প্রোফেসর শঙ্কুর সাথে আলাপ করেন এবং জানা ঐ একই বিষয়ে তাঁরও একটি পেপার ছিল। কিন্তু তিনি পড়েন নি। কারণ তাঁর সব কথা শঙ্কু বলে ফেলেছেন। এরপর সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শঙ্কুর বন্ধু জেরেমি সন্ডার্স তাঁকে কারবোনি সম্বন্ধে জানায়। কারবোনি যুবা বয়সে ছিল আর্কিটেক্ট। টুরিন শহরে ইটালিয়ান সরকার একবার একটি স্টেডিয়াম তৈরীর পরিকল্পনা নেয়। কারবোনির কাকা ছিলেন ইটালিআন মন্ত্রী মন্ডলীর সদস্য। সেই ই তাঁকে কাটি পাইয়ে দেন। তার নকশা অনুযায়ী স্টেডিয়ামের কাজ খানিকটা এগোলে তাতে ফাটল ধরে। তখন কারবোনি সে কাজ থেকে অপসৃত হন। তার খুব বদনামও হয়। তারপর বছর আষ্টেক পর তিনি পদার্থ বিজ্ঞানীহিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

এইসব শুনে শঙ্কুর কারবোনির প্রতি অনুকম্পা হয়। তখন তিনি কারবোনিকে চিঠি লিখে নিজের এই গবেষনাটি বন্ধ করে দেন শঙ্কু। এও বলেন চিঠিতে কারবোনি যেন তাঁর কাজ চালিয়ে যান এবং শঙ্কুকে আর তাঁর প্রতিদ্বন্দী ভাবার কোন কারন নেই।

এর পরের ঘটনা শ্রীমান নকুড়চন্দ্র আগমন। এই ঘটনা পড়লে মনে হতে পারে মূল গল্পের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ গল্পটি পাঠ শেষে বোঝা যায় এই ঘটনা ভীষন ভাবেই মূল গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই নকুড়বাবু বয়সে প্রোফেসর শঙ্কুর অনেক ছোট। কিন্তু বন্ধু। ইনি মাকড়দায় থাকেন, মাস তিনেক অন্তর অন্তর শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করে যান। টেলিপ্যাথি, থটরিডিং, ক্লেয়ারভয়েন্স, অতীতদর্শন, ভবিষভৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুন আছে তাঁর। এমনকী, মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, এবং

টিপ্পনী

মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। এর ব্যাখ্যা এখনো বিজ্ঞান দিতে পারেনি। তবে ওঁর এ ক্ষমতাকে প্রোফেসর শঙ্কু সমীহ করেন। মানুষ হিসেবেও উনি অমায়িক। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। তবে উনি যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি রাখেন।

নকুড়বাবু সম্বন্ধে শঙ্কু এখানে যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রত্যকটি এ গল্পেও কাজে লাগাবে। সেই কারনে লেখক, পাঠকের সঙ্গে একটা পরিচয় করিয়ে রাখলেন যাতে পরবর্তীতে অসঙ্গত মনে না হয়।

কথায় কথায় ইউ. এফ. ও র ছবি পেপার ধেকে নকুড়বাবুকে দেখালেন। ঐ ছবি দেখে নকুড়বাবু বলে উঠলেন তিনি আকাশে দেখেছেন এ বস্তুটিকে। এই নিয়ে কথার ফাঁকেই নকুড়বাবু শঙ্কুকে বললেন যে আগামীতে তার বিপদের আশঙ্কা আছে। এই কথাকে প্রোফেসর শঙ্কু গুরুত্ব দেন। এরপর শঙ্কু নকুডবাবুর বিশেষ ক্ষমতার যত্নবান হতে বলেন। কোন কারনে যদি সেই ক্ষমতা কমে যায়, তাহলে শঙ্কু তাঁর নিজের তৈরী ওষুধ 'সেরিব্রিলান্ট' দেবেন। এ ওষুধ মাথা পরিষ্কার ও অনুভূতি গুলোকে সজাগ রাখে।

এরপর ২৫শে সেপ্টেম্বরের লেখা থেকে জানা যায় যে গ্রিক সভভতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের উপর দু'হাজার বছর আগের তৈরী মর্মর প্রাসাদ পার্থেনন ধ্বংস হয়ে গেছে। কারা ধ্বংস করেছে জানা যায় নি। তবে এ তথ্যটুকু গল্পের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। সেটা এখানে কৌশলে জানানো হয়েছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর শঙ্কু লিখেছেন তাঁর জার্মান বন্ধ উইলহেল্‌স ক্রোল চিনঅভিযানে শঙ্কুকে আক্রমন জানিয়েছে। ক্রোল চিন সরকারের আমন্ত্রনে বতর্মানে সেকানেই রয়েছে। সেখান থেকেই শঙ্কুকে চিঠি পাঠায়। শঙ্কু তার উত্তরের সঙ্গে নকুড়বাবুকে নেবেন সে কথা জানিয়ে ক্রোলকে চিঠি পাঠান ল ক্রোল ব্রেজিলে নকুড়বাবুর আশচযফ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন। কাজেই নকুড়বাবুর যাবার ব্যাপারটিতে তিনি অনুমোদন করবেন বলেই শঙ্কুর বিশ্বাস। সন্ডার্স লন্ডন থেকে আসবে বলে ঠিক হয়। বলে রাখা দরকার এ অভিযান মূলত ইউ. এফ. ও. কে নিয়ে চিনের যে অঞ্চলে ক্রোল ও তার দল অবস্থান করছে সেকানেই কোথাও ইউ. এফ. ও অবস্থান করছে। একবার পশ্চিম দিকে উড়ে যায় বস্তুটি। তারপর আবার পশ্চিম থেকে পুবে। এটা অনুসন্ধানের জন্যই শঙ্কুকে ক্রোলের চিঠি লেখা। চিন সরকার তাদের হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করে দিতে রাজি।

চিনে পৌঁছে একটা আশ্চর্য কবর শোনা গেল। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার এবং

ক্যামবোডিয়ার আংকোর ভাটের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকেই এই ঘটনায় ইউ. এফ. ও. কে সন্দেহ করছেন। সবাই মিলে ঠিক হল ঐ অজানা উড়ন্ত বস্তুটিকে খুঁজে বার করতেই হবে। পরদিন সকালে হেলিকপ্টারে করে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে আরো একজন যোগ হলেন। তিনি চীনা প্রত্নতাত্ত্বিক ড. শেং। তাকলা - মাকানের অন্তহীন বালুতরঙ্গের ওপর দিয়ে পাইলটসহ বাকী পাঁচ অভিযাত্রী উড়ে চলেছেন। এক সময় হেলিকপ্টার মাটিতে নামল। শেং আকাশ থেকে মাটিতে চারটে গভীর গর্ত দেখে ঐ অঞ্চলে নামার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে নেমে বোঝা গেল সত্যিই ইউ. এফ. ও. র পায়ের দাগ। এদিকে নকুড়বাবু তার বিশেষ ক্ষমতা বলে বলার চেষ্টা করেন যে ইউ. এফ. ও তে ভিনগ্রহের কোন প্রান নেই। আরো বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেচিলেন কিন্তু মাথায় চোট থাকার কারনে সব তিনি মনো জগতে ঠিক ঠিক দেখতে পেলেন না।

১১ই অক্টোবর, রাত ন'টার ডায়রি থেকে জানা যায় ঐ পাঁচজন যে অঞ্চলে ইউ. এফ. ও র পায়ের গভীর গর্ত দেখেছিলেন। সেখানেই আবার এসে হাজির হয় বস্তুটি। সবার মধ্যে ভীতি ও কৌতুল কাজ করতে থাকে। হঠাৎ দেখা যায় ইউ. এফ. ও র দরজা খোলা। পরামর্শ করে সবাই ঐ বস্তুটির মধ্যে ইঠল। হঠাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ভেতর থেকে ইংরেজীতে গলার আওয়াজ ভেসে এল। প্রোফেসর শঙ্কুর গলাটি খুব চেনা মনে হল।

১২ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় লেখা ডায়রি থেকে ইউ. এফ. ও. র সমস্যা সমাধানের কথা জানা যায়। ঘটনা পাঠককে বিস্মিত করে। ঐ চেনা গলাটি আসলে কারবোনির। কারবোনির কথা আগেই লেখক আমাদেদর জানিয়েছেন। এই কারবোনি দীর্ঘদিন ভিনগ্রহের প্রানদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন। আলফা সেনটরির একটি গ্রহের প্রানীদের সাথে যোগাযোগ করা গেছিল। তারা পৃথিবীতে আসে ল এসে পৃথিবীর ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তারা পৃথিবীর মানুষের কোন ক্ষতি করতে চায়নি। বরং উপকার করতেই এসেছিল। মারা যাওয়ার আগে তারা কারবোনিকে ঐ ইউ. এফ. ও টিকে চালাতে শিখিয়ে দেয়। কারবোনি তার পূর্বরাগের প্রতিশোধ নিতে একর পর এক পৃথিবির ঐতিহ্য - ইতিহাসকে ধ্বংস করে চলে। শঙ্কুদের নিয়ে ইটালিতে উড়ে গিয়ে সেখানকার সেন্ট পিটার্স গির্জাকে ধ্বংস করে। তারপর তার লক্ষ্যবস্তু হয় ভারতবর্ষের তাজমহল। এবার ইউ. এফ. ও উড়তে থাকে ভারতের দিকে। একসময় আকাশ থেকে তাজমহলদেখা যায়। কিন্তু হঠাৎই দেখা যাচ্ছে তাজমহল নেই। সেখানে যমুনা নদী আছে আর অসংখ্য শ্রমিক সাদা পাথর দিয়ে তাজমহল তৈরিতে মগ্ন। এটা দেখে প্রোফেসর শঙ্কু বুঝতে পারেন নকুড়বাবু অতীতের ঘটনায় এনে ফেলেছেন ভারতবর্ষকে। নকুড়বাবুর দিকে তাকাতে দেখা যায় তিনি ধ্যানস্থ। শঙ্কু কারবোনিকে বলে যে ইউ. এফ. ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অতীতের ভারতবষফে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কারবোনি একথা শুনে উন্মাদের মত সুইচ বোর্ড টিপতে থাকে। ভুলক্রমে হলুদ সুইচে হাত পড়ে যাওয়ায় পাশের নিষ্ক্রিয় রোবটি জেগে ওঠে। তারপর তাকে জাপটে ধরে মেরে ফেলে। বোঝা যাব যে ইউ. এফ. ও র ভারসাম্য নষ্ট করবে তাকে রোবট মেরে ফেলবে। এবার শঙ্কুদের পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে ইউ. এফ. ও বিদায় নেয়। মুহূর্তে আকাশে মিলিয়ে যায়।

এই গল্পটি এক অদ্ভুত রসের সঞ্চার করে মনে। একটা শিহরন জাগানো অনুভূতি দেয় ল একটা কল্পনা যেন ভীষন জীবন্ত হয়ে ওঠে মানস লোকে। এগল্পে সত্যজিৎ রায়ের লেখনী শৈলীকে আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। একেতো নিটোল কাহিনীবৃত্ত। তারপর সহজ সরল ভাষার বর্ণনা এই দু'এ মিলে এক নিখুঁত ছব তৈরী হয় পাঠক চিত্ত পটে। আমাদের ভীষন ভাবে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের নিজের জীবনের পড়াশুনো, বিদেশ ভ্রমন, কল্পনা, ছবি আঁকা - এসবই শঙ্কুর ওপর পড়েছে। সবমিলিয়ে এক অনবদ্য সৃষ্টি এই কল্পবিজ্ঞানের গল্প। বাংলা সাহিত্যের এক নতুন শাখাতে বটেই।

প্রোফসর শঙ্কুর চরিত্র

প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক। বাংলা কল্পবিজ্ঞানন কাহিনীর আসরে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে ওঁর আবভর্ভাব উনিশশো একষট্টি সালে। 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'র মধ্যে দিয়ে শঙ্কুর জয়যাত্রা শুরু। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক ও আবিস্কারক। তিনি মূলত পদার্থবিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরন। তিনি ৬৯টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন ও লিখতে পারেন। হায়ারোগ্লিফিক লিপি ও পড়তে পারেন। তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা হল তিনি পৃথবীর সব দেশের ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম, সামাজিক, রীতিনীতি এমন কি বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা রাখেন।

মহান শ্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত শঙ্কু সিরিজের মোট ৩৮ টি সম্পূর্ন ও ২টি অসম্পূর্ন গল্প লেখেন। এই সিরিজের প্রথম গল্প ১৯৬১ সালে 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি" নামে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পতেই শঙ্কু সবার কাছে প্রিয় চরিত্র হয়ে উঠলল। বিশেষ করে শিশু - কিশোরদের কাছে তো আরোই। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' লেখার সময় লেখক সত্যজিৎ রায় শঙ্কু চরিত্রটিকে নিয়ে সিরিজ করার কথা ভাবেননি। ১৯৬৪ সালে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্প 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়' থেকে মূলত শঙ্কু সিরিজের সূত্রপাত। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ক্ষুদ্র লেখা 'প্রোফেসার

শঙ্কু' শঙ্কু সিরিজের প্রথম গল্প। এখানে প্রোফেসর শঙ্কু সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিতি এবং কিছুটা রহস্যময়তা রাখা হয়েছে। এই সমগ্র অংশটুকু উদ্ধার করা গেল-

> " প্রোফেসর শঙ্কু কে? তিনি এখন কোথায়:? এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক।"

> "কেই কেউ বলে যে তিনি নাকি একটা ভীষন পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শোনা যায় যে তিনি কোন অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।"

প্রোফেসর শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়রিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছেল কাহিনীগুলি সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিচার পাঠকেরা করবেন।

এই সিরিজের গল্পগুলি প্রোফেসর শঙ্কুর জবানিতে ডায়রির আকারে বর্ণিত। এই গল্পগুলির পটভুমিকা পৃথিবী সহ গোটা বিশ্বব্রহ্মান্ড। প্রোফেসর শঙ্কু খাঁটি বাঙালী। তাঁর নিবাস তদান্তীন বিহারের গিরিড শহরে। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর দেখাশোনার জন্য প্রহ্লাদ এবং নিউটন নামের একটি পোষা বিড়াল। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর খ্যাতি। সমগ্র বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা তাঁর গুনমুগ্ধ এবং বন্ধু। মানুষটি বড় ভালো। তবে ভয়ঙ্কর অভিযানে তিনি অকুতোভয় আবার আত্মভোলাও বটে। অন্যদিকে আশ্চর্য সংযমী। এহেন মহান বিজ্ঞানীটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভা বিষ্ময়কর।

শঙ্কুর কোন কোন অভিযানে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন প্রতিবেশী অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় ও হিতাকাঙ্খী নকুড়বাবু। এরাও ককনো কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শঙ্কু চরিত্রকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে। যাইহোক, প্রোফেসর শঙ্কুর ৭২ টি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের কথা জানা যায়, সেইগুলি প্রসঙ্গে আলাদে করে পরে বর্ণনা করা হবে। সত্যজিৎ রায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রটি সৃষ্টির পিছনে প্রধান প্রেরণা ছিল তাঁর পিতা সুকুমার রায়ের গল্প 'হেসোরাম হুশিয়ারের ডায়রি'। অন্যমতে, এই চরিত্র সুকুমার রায়ের 'নিধিরাম পাটকেল' চরিত্রটি ছায়া বর্তমান।

শঙ্কুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শঙ্কু খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেন। ছাত্র হিসেবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তিনি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ল।জীবনে কোনদিন তিনি দ্বিতীয় হন নি। মাত্র ১২ বছর বয়সে শঙ্কু গিরিড়ির স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ল এরপর চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতার কলেজ থেকে আই. এস. সি এবং ষোল বছর বয়সে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

অন্যদিকে বিজ্ঞানী ও আবিস্কারক হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও পরিচিতি। 'সুইডিশ আকাদেমি অফ সায়েন্স' তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। ব্রাজিলের রাটানটান ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন ডক্টরেট । পাঁচটি মহাদেশের বিজ্ঞানীরা আবিস্কারক হিসেবে তাঁকে স্থান দিয়েছেন টমাস আলভা এডিসনের পরেই। তাঁর গবেষনাক্ষেত্র। গিরিড়ি হলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতা। তবে কর্মসূত্র তাঁকে সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। গেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, স্পেন, মিশর, নরওয়ে, সুইড়েন, তিব্বতে। সাহারা মরুভূমি, আফ্রিকার বনভূমি, সমুদ্রের তলদেশ, কিছু অজানা দ্বীপ এবং মঙ্গল গ্রহ, টাফা গ্রহে দুঃসা্সিক অভিযান চায়েছেন।

প্রোফেসর শঙ্কু তীক্ষ্নবুদ্ধি, নির্লোভ এবং সৎ। আত্মভোলা প্রকৃতির, আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর চরিত্রের, তা হল এক ঋষিসুলভ স্থৈর্য ও সংযমের অধিকারি তিনি ল একই সঙ্গে তিনি স্বদেশপ্রেমিক, বেদ, উপনিষদ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। আবার পৃথীবীর অন্যান্য দেশের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তিনি সমান শ্রদ্ধাশীল।

শঙ্কুর আবিষ্কার

প্রোফেসর শঙ্কুর মোট ৭২ টি আবিস্কারেদর কথা জানা যায়। এই সব আবিস্কার ও তাদেদর নামকরনের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের ভাষাপ্রীতি ও কৌতুকবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ল যেমন, শঙ্কু আবিস্কৃত রোবট বিধুশেখর সাধু ও চলিত বাংলায় কথা বলতে পারে। আবার তৃষ্ণানাশক বড়ির নাম 'তৃষ্ণানাশক বড়ি'। এছাড়া শঙ্কুর কিছু উল্লেখযোগ্য আবিস্কার হল -'বটিকা ইন্ডিকা', 'মিরাকিউরল', 'রোবু', 'অ্যানাইহিলিন পিস্তল', 'শ্যাঙ্কোপ্লেন', 'ফ্র্যাঙ্কোনস্টাইন-শঙ্কু ফরমুলা', স্ন্যাফগান বা নশ্যাস্ত্র, মিরাকিউরল, নার্ভিগার, অমনিস্কোপ, ম্যাঙ্গোরেঞ্জ, ক্যামেরাপিড়, লিঙ্গুয়াগ্রাফ প্রভৃতি।

এই সমস্ত কারনে বাংলা কল্প বিজ্ঞানের জগতে প্রোফেসর শঙ্কু অতি জনপ্রিয়

একটি চরিত্র। একেবারে খাঁটি বাঙালি চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক সমুজ্জ্বল বিজ্ঞানী চরিত্র হয়ে উঠেছেন তিনি। বাঙালীর বিজ্ঞানী ভাবনার আদর্শ কল্প চরিত্র এই প্রোফেসর শঙ্কু।

টিপ্পনী

হাস্যরস

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পগুলি বেশ রম্য রচনার ঢঙে রচিত ল গল্পগলি পড়তে কোথাও একঘেয়ে লাগেনা। গতি মন্থরতাও নেই এই গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলির মাঝে মাঝে সত্যজিৎ তাঁর নিজস্ব রীতির হাস্যসের পরিবেশন করে গল্পগুলিকে আরো আকর্ষনীয় ও মজাদার করে তুলেছেন। আমরা নির্বাচিত গল্প থেকে সেই হাস্যরসের সন্ধান করতে পারি।

প্রথমেই আসা যাক 'ব্যোমযাত্রির ডায়রি' তে। এখানে প্রোফেসর শঙ্কু নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেছেন। একদিন মর্নিং ওয়াক সেরে শোবার ঘরে ঢুকেকই একজন বিদঘুটে লোককে দেখে শঙ্কু চিকার করেউঠলেন। চিৎকার করেই তিনি বুঝতে পারলেন আসলে আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই চমকে উঠেছেন। ক'বছরে যে তাঁর চেহারা কেমন হয়েছে, তা তিনি নিজেই জানেন না। আয়না তো দেখনই না। আয়নার ওপর ক্যালেন্ডার টাঙানো থাকে। বছরশেষ হয়ে গেছে বলে হয়তো প্রহ্লাদ ক্যালেন্ডার সরিয়ে ফেলেছে আয়না থেকে এই বিপত্তি। এরপরই তাঁর নিজের আবিস্কৃত 'Snuff-gun' বা নস্যাস্ত্রর কথা জানা যায়। নামটি ভারি চমকপ্রদ, হাসির উদ্রেক করে। এর সম্বন্ধে শঙ্কু নিজে যা বলেন তা আরো রসপূর্ণ-

> "আমার Snuff-gun বা নস্যাস্ত্রটা ওর (প্রহ্লাদ) ওপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়। এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনও থামেনি।"

এবার আসা যাক বিধুশেখরের কথায়। বিধুশেখরের হচ্ছে প্রোফেসর শঙ্কুর আবিস্কৃত রোবট। সে প্রোফেসরের সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সময় যে বিশেষ উচ্চারণে বাংলা বলার চেষ্টা করে তা ভীষন হাসির উদ্রেক করে। বিধুশেখর মহাকাশে যেতে যেতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলে-

> "ঘণ্ডো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকে কেই ককুং খঙা।"

টিপ্পনী

প্রোফেসর শঙ্কু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, কিছুদিন আগে দ্বিজুরায়ের একটা গান গান গুন গুন করে তিনি বিধুশেখরের সামনে গেয়েছিলেন বিধুশেখরের এই গান তারই প্রথম লাইন অর্থাৎ -

"ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদেদর এই বসুন্ধরা।"

এই উচ্চারণ শুনে বোধকরি পাঠকবর্গ না হেসে থাকতে পারবেন না। এরকম হাল্কা হাসির হাওয়ায় গোটা গল্পটাকেই দুলিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

'স্বপ্নদ্বীপ' গল্পটাতে সত্যজিৎ স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমায় পাঠককে হাসিয়েছেন নিজেকে নিয়ে মজা করতে পারা হ'ল একটা উন্নত কমেড়ির লক্ষন। প্রোফেসর শঙ্কু বরাবর সেই কাজটিই করেছেন। এই গল্পে নিজের চেহারা সম্পর্কে যা বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা খুবই মজার -

> "তেরো বছর বয়সে আমার মাথায় প্রথম পাকা চুল দেখা দেয়। সতেরো বছরে টাক পড়তে শুরু করে। একুশে পড়তে না পড়তে আমার মাথা - জোড়া টাক - কেবল কানের দুপাশে, ঘাড়ের কাছটায় আর ব্রহ্মতালুর জায়গায় সামান্য কয়েকগাছা পাকা চুল । অর্থাৎ আজও আমার যা চেহারা, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ছিল ঠিক তাই।"

এই গল্পেই শঙ্কুর বেশ কিছু মজার আবিষ্কারের নাম জানা যায় যেমন - তেষ্টা মেটানোর বড়ির নাম 'তৃষ্ণানাশক'। এছাযা 'ট-পিলস', 'কফি পিলস' ইত্যাদি।

এই 'স্বপ্ননদ্বীপ' গল্পেই আছে সাতজন ইউরোপীয় মনীষী একসাথে বেপাত্তা হয়ে যান। অবিনাশ বাবু এবং শঙ্কু ঐ স্বপ্নদ্বীপ 'ফ্লোরোনা তে এসে তাদের দেখা পান। তাদের অবস্থার বর্ণনা করেছেন লেখক এভাবে -

> "একজন তাঁর মানিব্যাগ হইতে এক একটি করিয়া রৌপমুদ্রা বাহির করিয়া ব্যাঙ বাজি খেললার ভঙ্গিতে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আর একজন অদম্য উৎসাহে ডিগবাজি খাইতেছেন, আর একজন জাঙিয়া পরিয়া দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গিতে উত্তোলন করিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাহিতেছেন, আর একজন একটি ইংরেজি ছেলেভুলানো ছড়া - যার প্রথম পংক্তি 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ' - সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন।

শেষোক্ত ব্যাক্তিটিকে শঙ্কুমহাশয় 'হ্যামলিন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁর দিকে দক্ষিন হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইবামাত্র ভদ্রলোক ব্ল্যাকশীপ ছাড়িয়া 'জ্যাকাঞ্জিল' ছড়াটি আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।"

টিপ্পনী

এবর্ণনা রীতিমতো হাস্যব্যঞ্জক। এরকম নানান মুহূর্তে তৈরী করে সত্যজিৎ রায় পাঠককে হাসিয়েছেন।

এবার যদি 'একশৃঙ্গ অভিযান' গল্পটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এখানেও এমন সব বর্ণনা রয়েছে যা পাঠকবর্গকে হাসিতে মাতিয়ে দেয়। যেমন অবিনাশ বাবু শঙ্কুর সঙ্গে তিব্বত অভিযানে গিয়ে মানস সরোবরে গিয়ে যা করলেন তা রীতিমতো সবাইকে হাসিয়েছে-

" হ্রদের ধারে গিয়ে গায়ের ভারী পশমের কোটটা খুলে ফেলে দুহাত জোড় করে এক লাফে ঝপাং করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেখি তাঁর দাঁতকপাটি লেগে গেছে। ক্রোল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তৎক্ষনাৎ জলে নেমে ভদ্রলোককে টেনে তুলল। তারপর তাঁকে এ্যান্ডি খাইয়ে তাঁর শরীর গরম করল।"

'শঙ্কুর শনির দশা' গল্পটির নামের মধ্যেই মজা রয়েছে। গল্পটির বিষয়বস্তুও মজার। শেষটাও সেই মজা দিয়েই শেষ হয়। যদিও গল্পটিকে গোয়েন্দা গল্প বলাই সঙ্গত হবে। রহস্য গল্পও বলা যায়। তবে হাসির কোন কম্‌তি ছিল না এখানে। বিদেশে একবার গ্রোপিয়াসের বাড়িতে গিয়ে এক ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্স্কে শঙ্কু বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছেন-

"আমি মনে মনে বললাম - তোমার চেয়ে অন্তত দশগুন বেশি সুস্থ আমি। তুমি একমাস নখ কাটেনি, তোমার ঠোঁটে সিগারেটের কাগজ লেগে আছে, তোমার জিভের দোষে কথা জড়িয়ে যায় - তুমি করবে আমার মাধায় ব্যামোর চিকিৎসা?"

শঙ্কুর ব্যাঙ্গের আড়ালে হাসির রেখা দেখা যায়।

এখানে শঙ্কুর 'অ্যানাইহিলিন গান' বা নিশ্চিহ্নাস্তএর ভালো একটা প্রয়োগ দেখা যায় ল গল্পের অন্তিমে শঙ্কু যখন নিজেরই মতো দেখতে নকল শঙ্কুকে অর্থাৎ রোবটকে

টিপ্পনী

নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তার আগে বলে যে-

> " আমি আমার অ্যানাইহিলিন বন্দুকটি পকেট থেকে বার করলাম। আমার এই পৈশাচিক জোড়াটিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে তবেই মুক্তি।"

তখন আমাদের এক বড় বোঝা মন থেকে সরে যায় এবং এক প্রশস্তির হাসিতে মন ভরে ওঠে।

আমরা এই আলোচনায় আর একটি গল্পের উদাহরণ দেব। গল্পটি 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও'। এটি কল্পবিজ্ঞানের একটি আদর্শ গল্প। রম্যতাও গল্পটির একটি দিক এখানে শ্রীমান নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের উপস্থিতি গল্পের এক নির্মল হাস্যরসের আধার। এই নকুড়বাবুর আশ্চর্য ক্ষমতা। টেলিপ্যাথি, থটরিড়িং, ক্লেয়ারভয়েন্স, অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুন আছে এঁর। এমনকি, মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেকসময় চোখের সামনে দেকতে পান। মনেদর জোরে তা আবার অন্যলোককে দেখিয়ে ও দিতে পারেন। এহেননকুড়বনাবু দুতিন মাস অন্তর প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করে যান। এবারও এসেছেন। এসে বললেন এবার তিনি পড়াশুনো করছেন। কারন যে সব অতীতের ঘটনা তিনি দেখতে পান, যে ঘটনা জানা না থাকার কারণে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় যে, আসলে তিনি কি দেখছেন যেমন এদরকমই একটি ঘটনার বর্ণনা তিনি করলেন-

> "দু' মাস আগে ৪ঠা শ্রাবন একটা দৃশ্য দেখলুম। বিভৎস দৃশ্যে একজন দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা লোক বসে আছে, তার গায়ে অনেক গয়নাগাটি, তার সামনে এনে রাখা হ'ল একটা থালা। থালার উপর একটা নকশা করা কাপড়ের ছাউনি, সেটা তুলে দেখানো হ'ল, তাতে রাখা আছে একটা মানুষের মুন্ডু - এই সবেমাত্র কোপ মেরে ধড় থেকে আলাদা করা হয়েছে সেটাকে।"

শঙ্কু বলেন 'আওরঙ্গজেবের ঘটনা কি?' তখন নকুড়বাবু জানা

> "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বই পড়ে তা্ই তো মনে হয়। আর মুন্ডুটা তাঁর দাদা দারা শিকোর।"

ঘটনাটা যতোই আশ্চর্যজনক হোক বিষয়টা মজর।

এরকম অসংখ্য ঘটনা তুলে দেখানো যেতে পারে। "প্রোফেসর শঙ্কু'র গল্পের হাস্যরসিকতা গুলোকে। এই কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো শুধু রহস্য রোমাঞ্চ গল্প হয়েই থাকেনি। সত্যজিৎ রায়ের বিশিষ্ট লেখনীর গুনে তা হাস্যরসেরও উৎকৃষ্ট আধার হয়ে উঠেছে, যা গল্পের মাধুর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

টিপ্পনী

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. শঙ্কু সমগ্র - সত্যজিৎ রায়

২. সত্যজিৎ রায় : তথ্যপঞ্জি - দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র

১. প্রোফেসর শঙ্কু - উইকিপিড়িয়া, মুক্তবিশ্বকোষ

২. সত্যজিৎ রায় - উইকিপিড়িয়া, মুক্তবিশ্বকোষ

সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

১. তোমাদের পাঠ্য 'শঙ্কু সমগ্র' এর নির্বাচিত গল্পগুলির গোত্র নির্ণয় করো।

২. প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র আলোকচনা কর।

৩. তোমাদেদর পাঠ্য গল্পগুলি অবলম্বনে 'শঙ্কু সমগ্র' - এর গল্পগুলির হাস্যরসের পরিচয় দাও।

৪. প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযানের দুই বাঙালী সহযাত্রী অবিনাশবাবু ও নকুড়বাবুর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৫. শঙ্কু সমগ্রের নিবর্বাচিত পাঠ্যগল্প অবলম্বনে লেখক সত্যজিৎ রায়ের রচনা শৈলীর পরিচয় দাও।

টিপ্পনী

চতুর্থ একক নারায়ন দেবনাথ

টিপ্পনী

ভারতীয় শিল্পকলার স্বর্নযুগের শুরু হয় চিত্র শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় ও যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের হাত ধরে। এঁদের শিল্পী পরিচিত হল :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

জন্ম : জোড়াসাঁকো কলকাতা। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুর্রষ্ঠা এবং চিত্রশিল্পী। কাব্যে, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই যেমন তাঁর অবদান অসামান্য তেমনি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাঁর চিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্নই চিত্রশিল্পীরূপে তিনি প্রাচ্য রীতির দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করেন নি, তিই অবলম্বন করেছেন প্রতীচ্য রীতির একেবারে আধুনিক ধারাটি, যেখানে অবয়ব, আবেগ ও আবেষ্টনীর সবই প্রধানত সংকেত নির্ভর, রূপ যেখানে অরূপ ও নিরূপের মধ্যে দোদুল্যমান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫২)

জন্ম : জোড়াসাঁকো কলকাতা। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতিকে পুনরুদ্ধারের সাধানায়ব্রতী অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রীতিতে পাষ্টেল, জল রং, তেল রং ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে কখনই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। ভারতীয় রীতিতে আঁকা তাঁর প্রথম চিত্রাবলী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। রাজমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা প্রভৃতি চিত্র ভারতীয় আঙ্গিকের ছাপ সপষ্ট। পরবর্তী যুগের বহু বিখ্যাত শিল্পী একসময়ে তাঁ শিষ্যত্ব গরহন করেছিলেন। সারা ভারতেভারতীয় চিত্রঙ্কন বিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি আটটি রূপে স্গবীকৃতি। শিল্পীর বিখ্যাত কয়েকটি চিত্রাবলী - 'সাহাজাদ পূঠ দৃশ্যাবলী', 'আরব্যোন্যাসের গল্প', 'কবিকঙ্কন চন্ডী' বিখ্যাত একক চিত্র - 'প্রত্যাবর্তন', 'জারনিস এন্ড সাজাহান', 'ভারত-মাতা' প্রভৃতি।

নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)

জন্ম - মুঙ্গের - খড়্গপুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য নন্দলাল বসুর মাধ্যমেই

টিপ্পনী

ভারতীয় চিতরজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুস্থ সমন্বয় সাধিত হয়েচে। নন্দলাল বসুর ছাত্রাবস্থায় আঁকা উত্তরকালের বিখ্যাত ছবি - 'শোকার্ত সিদ্ধার্ত', সতী', 'শিবসতী', 'জগাই মাধাই', 'কর্ণ', ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা', নটরাজের তান্ডব প্রভৃতি ল শান্তিনিকেতনের কলাভবনে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। 'পঞ্চপান্ডের মহা প্রস্থান' 'উমার তপস্যা' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট শিল্প সৃষ্টি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪ -

জন্ম - কলকাতা। ছোট থেকেই ক্ষীন দৃষ্টির অধিকারী বলে অভিভাকদের ছিল উৎকণ্ঠা। শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ছাত্র রূপে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেন। পরে ছোটোদের আঁকা শেখাতেন। একসময়ে কলাভবনের গ্রন্থাগারিক হন, এবং তারও পরে শিল্পী হিসাবে জাপান পরিভ্রমন করেন, কাজের ভার নিয়ে নেপাল যান, মুসোরীতে অঙ্কন শিক্ষালয় খোলেন, বিহার সরকারের কলাভবনে চাকরিও করেন। তারপর বেশ কয়েকবছর আগে তা চোখের আলো নিভে যায়। তাঁর নিজের ভাষায় - 'আলোর জগত থেকে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আমরা শিল্পী জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।' এই অধায়ের পরিচয় পাওয়া যাব তাঁর রচিত বিভিন্ন চিত্রে যা তাকে অনন্য সাধারন মর্যাদা দান করেছে। তাঁর স্মৃতিকথমূলক গরন্থ 'চিত্রকল্প' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২)

জন্ম - বেলিয়াতোড়, বাকুড়া। ভারতি চিত্রকলায় যামিনী রায়ের স্বকীয়তা বিশিষ্ট স্থানে অধিকার করে আছে। ইন্ডিয়ান অ্যাকাড়েমি অব আর্টের প্রত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হবার সময় তাঁর শিল্প খ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। একসময়ে কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ছবির শৈলীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করে নিজের চিন্তাধারা অনুসারে চিত্রচর্চা শুরু করেন। তখন সমতল কাগজ ছেড়ে অসমতল বুনেটের প্যাটার্ন সংবলিত ক্যানভাস ব্যবহার করতে থাকেন ল তাঁর তুলিতে রাধাকৃষ্ণ ও যীশুর মতোই সরলতাব ফুটে উঠত গ্রাম্য চাষি, কামার, কুমোর, ফকির, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রতিটি ছবি। 'মা ও ছেলের', 'গনেশ জননী' প্রভৃতি ছবি তার বিশিষ্ট অঙ্কন শৈলীর অন্যতম নিদর্শন।

ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে হাওয়া বদলের পালা আসে। সত্তর দশকে এসে যে সব বাঙালী চিত্রকর শিল্পী প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন তাদের মধ্যে সোমনাথ হোর, গনেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য ও যোগেন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ও চিতরশিলপের আর একটি ধারাও বিকশিত হচ্ছিল গ্রন্থ চিতরনের মাধ্যমে ল শিশুপাঠ্য গ্রথগুলি এবং নানারকমের পত্রপত্রিকায় চিত্রশিল্পের এই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। 'সন্দেশ', মৌচাক, 'শুকতারা', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি পতরিকায় উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, সত্যজিত রা, বলাই রায়, শৈল চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরা নিয়মিত তাঁদের চিতরনে অঙ্কনের দ্বারা পাঠকদের মুগ্ধ করতেন।

আর এক দিকপাল শিল্পী হলেন নারায়ন দেবনাথ। গত ষাট বছর ধরে গল্প বৈচিত্র্যে উপস্থাপনায়, অঙ্কন শিল্পে, কৌতুক রস পরিবেশনে তিনি পাঠককূলকে মুগ্ধ করে চলেছেন। পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠায় ও নৈপুন্যের গুনে। তাঁর লেখার বিষয় এবং সেই অনুযায়ী অনবদ্য ছবিগুলি পাঠক হৃদে কৌতুক রসের ফল্গুধারা বইয়ে দেয়। নারায়ন বাবুর রচিত সে সকল কাহিনীর পাশেই তাঁর রচিত ছবিগুলো যখন দেখা যায় তখন বোঝা দুষ্কর হয় - কাহিনী না চিত্র - কোনটি শ্রেষ্ঠ।

নানা মেজাজের কাহিনী তিনি রচনা করেছেন। কখনও হাসির কহিনী, কৌতুক রসের ফলগুধারা, কখনও জীবজন্তু বা শিকারের কাহিনী আবার কখনও বা তা ভৌতিক গল্প বা গোয়েন্দা কাহিনী হয়ে উঠেছে। সবকিছুতেই ছিল অনবদ্য গ্রন্থ চিত্রন। বিজ্ঞাপন জগতেও ছিল তাঁর প্রসিদ্ধ চিত্রনের অজস্র উদাহরন।

এদেশের কমিক চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ হলেন নারায়ন দেবনাথ। রেখা এবং লেখায় সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। তাঁর ছবি লেখায় পরিচিত বিষ চিল মজার অভিব্যাক্তি ও সংলাপ রচনায়। জীবজন্তুর অ্যানাটমি আঁকায় তাঁর অসাধরন দক্ষতা ছিল।

বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন গল্পের ছবি একেঁছেন তিনি। গল্পের এই ইলাসট্রেশন রচায় নারায়নবাউর সমকক্ষ তখন অল্প কয়েকজনই ছিলেন। এই ইলাসট্রেশন রচনার সুযোগ সুবিধা আজকে যেমন আছে - অঙ্কন শিক্ষার কলেজ থেকে বেরিয়ে তখন কিন্তু এরকম সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ব্যবসায়ীর দোকানের নামে কিছু সিনেমা স্লাইডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ছবি হয়তো কোনো কিছুর দোকানের নামে বিজ্ঞাপন এঁকে দিয়ে, স্লাইড তৈরি করা তাঁর অন্যতম কাজ ছিল।

নারায়ন দেবনাথ নামটি উচ্চারিত হলেই মানুষের মনে ভেসে ওঠে তার কমিকস্ সিরিজের কথা - হাঁদা ভোদা, বাটুল দি গ্রেট আর নন্টে ফন্টের কাহিনী - শুধু তাই নয় এরা কেবল তাদের প্রকৃতি নয়, আকৃতি নিয়েও মানুষের মনকে আন্দোলিত করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আর্ট কলেজে ফাইন আর্টস এর ছাত্র ছিলেন তিনি কিন্তু নিউজস্ব প্রতিভার গুনেই আয়ত্ত করেন কমিকস শৈলী - এ কথা অনস্বীকার্য।

তখন বাজারে 'শুকতারা' পত্রিকা রমরমিয়ে চলছে। শুধু মলাটে নয় পত্রিকার ভেতরেও থাকত নানা গল্পের ছবি। প্রখ্যাত অনেক শিল্পীর আঁকা ছবিই থাকত সেখানে। এ ছবিগুলো নারাবন আবুকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল, বিশেষ করে প্রতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি দেখে। ওই পত্রিকায় ছবি আকার জন্য তাঁর মনটা তখন ছট্‌ফট্ করত। তারপর হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এল শুকতারা পত্রিকার প্রকাশক 'দেব সাহিত্য কুটিরের পরধান মাননীয় শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের। এখান থেকেই শুরু হল তাঁর প্রতিভা বিকাশের যাত্রা। সেই যে শুরু হল থেমে যায়নি নব্বইর ওপর য়স হয়েছে তবু সে যাত্রা এগিয়ে চলেছে।

নারায়ন বাবু এগোচ্ছোন তবে এখন আর ইলাস্টেশন নয় - চলছে ছবিতে গল্প অর্থাৎ কমিকস্। তার কমিকস সংগ্রহের তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় শিল্পকলার যাতরা লগনের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীর পরিচয় দাও।

২। গ্রন্থ চিত্রনের মাধ্যমে শিল্পকলাকে যাঁরা পরিপুস্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজন শিল্পীর নাম উল্লেখ করো - এদের সঙ্গে নারায়ন দেবনাথের পার্থক্য কোথায় - আলোচনা করো।

৩। বাংলা ভাষায় রচিত শিশুপাঠ্য বই এবং পত্রপতরিকার নাম উল্লেখ করো। সেই সব পত্রপত্রিকায় নারায়ন দেবনাথের কিধরনের চিত্র প্রকাশিত হতো ? চিত্রগুলির জনপ্রিয়তার কারন কী?

জন্ম ও বংশপরিচয়

টিপ্পনী

হাস্য রসাত্মক চিত্রনে পুষ্ট মজাদার কাহিনীর স্রষ্টা নারায়ন দেবনাথ জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের শরৎকালে হাওড়া জেলার শিবপুর শহরে। স্বর্ন ব্যবসায়ী পিতা হেমচন্দ্র দেবনাধ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী মাটির কাছাকাছি মানুষ। তাঁর মায়ের নাম শ্রীমতী রামন সোনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনেক আগেই অধুনা বাঙলাদেশের বিক্রমপুরের মুনসীগঞ্জ থেকে এসে হেমচন্দ্র বাবু শিবপুরে ভাইয়ের সঙ্গে কমলা শিল্পালয় নামে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

হাওড়া জেলার বি, কে, পাল ইনস্টিটিউশান থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, নারায়ন বাবু Indian Art College এ Fine Arts এ ভর্তি হন, তখন দুনিয়া কাঁপানো দ্বিতীয় বিশ্যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে ল আকাশে বাতাসে চলছে বারুদের গন্ধ। অনিশ্চয় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুর্ভাগ্যবশত কলেজের শেষ পরীক্ষায় বসতে পারলেন না। প্রার্থিত ডিগ্রীও তাঁর অধরা রইল।

তবে তাঁর পেশাগত সাফল্যের অঙ্কুরোদগম হল দেবসাহিত্য কুটির নামক প্রকাশনা সংস্থার উর্বর পলিতে। ১৯৪৯ -৫০ সালে তিনটি ছবির মজাদার অলকঙ্করনী করে পেলেন ৯ টাকা। তাঁরভবিষ্যৎ জীবনের দিশা যেন ঠিক হয়ে গেল।

নারায়ন বাবুদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল সোনার। বাবা হেমচন্দ্র দেবনাথের ছিল গয়নার দোকান শিপুরেই। কিন্তু নারায়ন বাবুর বাবা, কাকা কেউই নারায়ন বাবুকে সেইখানে ঢোকান নি। ছোটোএলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। কোনো ভালো একটা ছবি পেলেই তিনি তাকে কপি করতেন। তাই বাড়ি থেকে তাঁকে আর্ট কলেজেই ভর্তি করে দেওয়া হল।

উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি

হাস্যরসাত্মক শিল্পী নারাবন দেবনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল :

ক. হাঁদা - ভোঁদা

খ. বাটুল দি গ্রেট

গ. নন্টে ফন্টে

ঘ. ব্লাক ডায়মন্ড ইন্দ্রজিৎ রায়

ঙ. পটল চাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান

চ. কৌশিক রায়

ছ. বাহাদুর বেড়াল

জ. ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

ঝ. পেটুক মাস্টার বটুকলাল

ঞ. সুটকি-মুটকি।

তাঁর প্রথম ব্যঙ্গচিত্র হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবি ছবি'। বারানসির সর্বোদব প্রকাশনা সংস্থা থেকে একই বছর বাঙলা ও হিন্দিতে প্রকাশিত হল, তাঁর প্রথম জনপ্রিয় ব্যঙ্গ চিত্র হাঁদ-ভোঁদা শুকতারা প্রকাশনা সংস্থা (শিশুদেদর) থেকে প্রকাশিত হবার পর চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করল। নন্টেফন্টে প্রকাশনা জগতের আলো দেখিয়েছে ১৯৮৯, ডিসেম্বরে। হাঁদা-ভোঁদা সুদীর্ঘ ৫৫ বছর পেরিয়ে এখনও রস পিপাসু মানুষের মনোরঞ্জন করে চলেছে। কমিকসের রচয়িতা হিসাবে তিনি হলেন প্রথম ও একমাত্র ডি. লিট উপাধি প্রাপ্ত।

তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে ডিটেকটিভ কৌশিকক রায় (শুকতারা ১৯৮৩ থেকে) ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু (ছোটোদের আসর, ১৯৮৩থেকে) তার তঁরি বাঙলা কমিকস্ দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পুষ্টিলাভ করে স্রোতস্বিনীর মতো প্রবা্মান। কমিকসে তাঁর নিজস্বতা ছাড়াও তাঁর শিল্পীর তুলিতে শিশুদের উপন্যাসের অলংকরন সুন্দর সুচারু রূপ পেয়েছে। তাঁর কমিকস গুলো কলকাতার শুকতারা এবং কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

এমন কোনো বাঙালি পাঠক নেই যারা তাঁরহাঁদা-ভোঁদা , বাটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টের সাধে পরিচিত হন নি। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে বাঙালী পাঠকের কাছে সন্দেহাতীত ভাবে জনপ্রিয় শুকতারা, বাঙলা মাগাজিনে প্রকাসিত হয়, কিন্তু কমিকস্ বুক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তক বিপনীতে শোভা বর্দ্ধন করে চলেছে।

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা

শিল্পী নারায়ন দেবনাথের সৃষ্টির বৈশিষ্ট হল - নির্ভেজাল সারল্য। তিনি কখনই কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কষাঘাতে জর্জরিত করেন নি। আর তার অনবদ্য সৃষ্টি ছিল পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব বিহীন।

টিপ্পনী

তাঁর সষ্টির প্রধান উপকরন হল মজাদার কথোপকথোন আর আকর্ষনীয় চরিত্র চিতরনের মিশেলে তৈরি মন কেড়ে নেওয়া ব্যঙ্গ কৌতুক। সময়ের গন্ডী পেরিয়ে শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক অসংখ মানুষের ভালো লাগা আর ভালোআসা তাঁর শিল্পী জীবনের চলার পথকে সহজ, সুন্দর করে তুলেছে। ১৯০৭ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মাননীয় মাননীয় এ. পি. জে আব্দুল কালাম তাঁর কৃতিত্বকেস্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন, এই শিল্পী মানুষটির অবসর বিনোদনের উপায় হল আলোকচিত্র বিদ্যা এবং পুরনো সুরের চর্চা।

১৯৪০ সালে সমসাময়িক প্রকাশনা সংস্থার মধ্যে অগ্রগন্য দেব সাহিত্য কুঠির - এ চিত্র অলংকরনের কাজে যোগ দেন তিনি। এখানে সে সময়ের বিখ্যাত শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, বলাই বন্ধু রাব প্রভৃতির সান্নিধ্যে এসে অভিজ্ঞতায় স্ফীত হন। এখানকার কাজ ও বেতনে খুশিই ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে একটা সাদা কালো চিত্রনের বিনিময়ে পেতেন ৩ টাকা। কিন্তু অনেক খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি ইতাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে।

পঞ্চাশের দশকের সুরুতে দেবসাহিত্য কুটিরের শুকতারা পত্রিকায় ধারাবাহিক চিত্র তৈরির আহবানে সানন্দে সম্মত হন। উপকরনের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর অনিসন্ধিৎসু মনে অনুনকরনীয় পর্যবেক্ষন ক্ষমতা থেকে। তিনি জানিয়েছেন শৈশবে বাড়ির জানালার সামনে বসে গভীর আগ্রহে পথে চলমান মানুষদের লক্ষ্য করতে করতে চিরজীবি দুটি চরিত্র হাঁদা-ভোঁদার সন্ধান পান। এর মধ্যে স্থূলকায় ধীর স্থির অতি সাবধানী চরিত্রটি হল হাঁদা। আর তার সহকর্মী ভোঁদা যেমন চটপটে তেমনি আত্মম্ভরী এবং সবসময়ই কোন না কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পরে। ১৯৫০ এর শুরুতে হাদা-ভোঁদার কমিক যাত্রা শুরু হয়। শুকতারা পত্রিকার ছ পাতায়।

আঁা ভোঁদার সাফল্যে অনুপ্রানিত হয়ে 'উটকি-মুটকি' নামে দুটি মেয়ের কাহিনী রচনা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ওই দুটো দুষ্ট মেয়ে পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি।

নারায়ন দেবনাথের সৃষ্ট মজার চরিত্রের জনপরিয়তা বেড়ে যাওয়ার ফলে তিনি এবার নতুন আঙ্গিকে একটি ভিন্নধর্মী কমিকস পরিবেশন করতে চাইলেন, জন্ম নিল বিখ্যাত কমিক চরিত্র 'বাঁতুল দু গ্রেট'। তার বিশল বপু, পেশীবহুল বাহু - মনে হয় অপরাজে। কিন্তু শরীরের অউপাতে ছোটো ছোটো সরু সরু পা দুটি আর বালকোচিত মুখাকৃতি সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করে। তাপে বে কায়দাব ফেলার একাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে সবসময়েই

টিপ্পনী

স্বীয় মর্যাদা অধিষ্ঠিত থাকে।

টিপ্পনী

১৯৬৫ সালে বাটুলের আবির্ভাব লগ্নে ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে দেশের পরিস্থিতির উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাটুলকে যুদ্ধে বীর নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করা হল। পেশীবহুল হাতে ট্যাঙ্ক তুলে মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে আক্লশো শত্রু দমনে নিক্ষেপ করে। মথের এক আওয়াজে কামানের গোলার গতি পরিবর্তিত হয় আর তাতে শিশুমনের ইচ্ছাপূরন সম্ভব হয়। প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাটুলের আশাতীত সাফল্য আসে।

বাটুল দি গ্রেটের জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশিত হল যাদুকর পটলচাঁদের কাহিনী। তবে তাঁর অন্যন্য সৃষ্টির মতো কাহিনী আকর্ষনীয় হতে পারে নি।

তবে১৯৬৯ এর তাঁর নন্টে ফন্টে আবার পাঠকের দরবারে নতুন করে সমাদৃত হয়।

কমিকসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর অলঙ্করন শক্তি ধীরে ম্লান হতে থাকে। ১৯৭০ সালে কমিক্স রচনায় ছিলেন অত্যন্ত ব্যপ্ত। অলঙ্করনের কাজে সময় দিতে পারছিলেন না। দেব সাহিত্য কুটিরও তখন পড়তির মুখে তবু বলিষ্ঠ দৃশ্যায়ন রঙে রেখায় তুলিতে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর স্মরনীয় কাজ বনে জঙ্গলে, বাঘ বাহাদুরের দেশে আর টারজেনের ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে।

কমিকস্ এর যাত্রা হল শুরু

বাঙলায় কমিকস্ রচনার প্রস্তাব এল দেব সাহিত্য কুটিরের সম্পাদকের কাছ থেকে। নানা বর্নে, সৌন্ধবে, বিদেশী কমিকস্ পূর্ন থাকলেও আঙলায় কমিকস্ এর ভান্ডার ছিল শূন্য। যুগান্তর পতরিকায় প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ির 'শিয়াল পন্ডিত' সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

হাঁদা ভোঁদা প্রকাশিত হবার পর কমিকস্ পাঠকের আগ্রহ উর্দ্ধমুখী হতে থাকে। হাঁদা ভোঁদা চিত্রিত করেন পেন্সিল এবং কালির আচরে। কোন রকম রঙের জৌলুষ ছিল না।

বাটুল দি গ্রেট নারায়ন দেবনাধের প্রথম রঙিন কমিকস্। তিনি জানিয়েছেন কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ একদিন 'বাটুল' তাঁর চিতরনে ভেসে

ওঠে। নামকরনের মতো বাটুলের দেহ সৌষ্ঠবও ভেসে ওঠে তাঁর মনের গহনে কল্পনার তুলিতে।

টিপ্পনী

রচনা শৈলীর ক্রমবিকাশ

বাঙলা দেশের মুক্তি যুদধের সয় পত্রিকা সম্পাদকের থেকে পরামর্শ এল বাটুলকে অপরাজেয় করে রাখার। তাই তাঁর বাটুল হয়ে উঠল অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। ট্যাঙ্ক, মিশাইল, বিমান চালাতে দক্ষতার শীর্ষে। নিমেষে গোলাগুলি বর্ষিত হয় শত্রুর উপর অভিনব ক্রিয়াকান্ডের ডালি নিয়ে বাটুল উপস্থিত হয় পাঠকের সামনে।

১৯৬৯ থেকে 'নন্টে ফন্টে'র পথচলা সুরু হল কিশোর ভারতী পত্রিকা থেকে।

স্বাতীনভাবে শিল্পীর তুলি নিয়ে নারায়ন বাবুর আত্মপ্রকাশ শুকতারা পত্রিকায় ১৯৫০ এ। বাঙলায় তার অলংকরনের কাজের সংখ্যা অনতিক্রম্য। অলংকরনের শিল্পী হিসাবে তিনি খাতির সব্বোর্চ্য স্তরে পৌঁছে গেছেন। টারজানের গল্প পরিবেশন করেছেন দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে। মজার আঙ্গিকে বিদেশী উপন্যাস আঙলায় ধরা পড়েছে তার অনুপম শৈল্পিক দক্ষতায়।

জনপ্রিয়তা

কমিকস্ সৃষ্টি নারায়ন দেবনাথকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। শুকতারা কিশোর ভারতী, কিশোর মন, ছোটোদের আসর পক্ষীরাজ -এ প্রকাশিত তাঁর কমিকস্ গুলো কেবল শিশু মনকেই নয়, বয়স্ক পাঠকদেরও আবিষ্ট করে রেখেছে। তাঁর হাঁদা ভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে ১৯৮০ থেকে পাঠকসমাজে মোহ বিস্তার করে রেখেছে। ১৯৯০ এর শেষদিকে নন্টে ফন্টের কমিকস্ সঙ্কলন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ২০০৩ থেকে তার পূর্বতম রচনা রঙিন অবয়ব নিয়ে জনসমক্ষে উদঘাটিত হয়।

সমপ্রতি বাটুল দি গ্রেট, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে ফন্টে সচিত্র চিত্রমালায় আবির্ভূত হয়ে নতুন যুগের শিশু হৃদয়ে অপরিমেয় মজাদার আনন্দের সঞ্চার করেছে।

নির্ভেজাল আড্ডার মেজাজে প্রচলিত বাঙলা শব্দগুলি চরিত্রের মুখে বসিয়ে আবেগে উচ্ছাসে চরিত্রগুলিকে তিনি প্রানবন্ত করে তুলেছেন।

টিপ্পনী

তাঁর কমিক চরিত্রগুলো জনপ্রিয় হলেও প্রচার বিমুখ এই মানুষটি কিন্তু সংবাদমাধ্যম থেকে দূরত্ব বজা রেখে শান্তিপ্রদ নির্জনতা বেছে নিয়েছেন।

নারায়ন দেবনাথের নন্টে ফন্টে, বাটুল দি গ্রেট আজকাল টেলিভিশন এর পর্দাতেও ভেসে ওঠে।

নারান দেবনাথ নিঃসন্দেহে খ্যাতিমান কমিকস্ রচয়িতা। তাঁর তুলির ছোঁয়ায় হাঁদা ভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে প্রভৃতি যে চরিত্র গুলো ফুটে উঠেছে - জনপ্রিয়তার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এবং তার সীমারেখার বাইরে অগনিত মানুষের হৃদমাঝারে সাড়া জাগিয়েছে । তিনি চ্ছেন প্রথম শিল্পী যিনি কমিকস্ চিত্রায়নের জন্য ডিলিট উপাধি পেয়েছেন । বিভিন্ন পত্রপত্রিকা শুকতারা, কিশোরভারতী, ছোটোদের ম্যাগাজিনে তার অনুকরনীয় অলংকরন প্রকাশিত হয়ে তাঁকে খ্যাতি চুড়ায় এনে দিয়েছে।

তাঁর বাসগৃহে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ চারিতায় কমিকস্, বিভিন্ন গ্রন্থ, আন্তর্জতিক বইমেলা, রাজনীতি - নানা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মনোভাব ধরা পড়েছে বিভিন্ন সময়ে । অকপটে সব প্রশ্নেরই খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন তিনি।

বইমেলা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারন

তিনি জানিয়েছেন ময়দানে আয়োজিত প্রথম বইমেলায় তার অভিজ্ঞতার কথা।

স্বেচ্ছায় নিজের তাগিদে কখনও বইমেলায় উপস্থিত হননি । প্রকাশক বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে-কেউ তাঁকে মেলায় উপস্থিত করিয়েছেন। তিনি দেখেছেন বিভিন্ন ষ্টল বা পুস্তক বিপনিতে তাঁর বই বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। বইমেলার সম্পর্কে তিনি তাঁর সুখপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা গভীর তৃপ্তীর সম্পর্কে জানিয়ছেন। এমন কি, সুদুর মুম্বাই থেকে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে জনৈক পাঠক বইমেলায় এসেছিলেন - তার বই কেনার তাগিদে।

৯০ বছর বয়সেও তিনি বই মেলায় উপস্থিত হয়েছেন - সে অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন 'দীপ প্রকাশনীর' আমন্ত্রনে গত বছর তাঁর বইমেলায় পদার্পন ঘটেছিল। বৃদ্ধবয়সে চলার ছন্দ শ্লথ হলেও হাত দুটো কিন্তু শ্লথ সচল, আর মনও সজনশীল। আর এই পরিনত বয়সেও মনের মাধুরী মিশিয়ে দেব সাহিত্য কুটির - শুকতারা - পত্রভারতী এবং অবশ্যই অগনিত গুনমুগ্ধ পাঠকের জন্য সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তিনি মাতোয়ারা।

বইমেলায় প্রতিবছর পুরস্কার প্রদান করা হয়। পাঁচশ টাকায় বই কিনলে লটারিতে গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা।

টিপ্পনী

নারায়ন বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস বই প্রেমিক মানুষ বই কিনতে অবশ্যই মেলায় আসবেন। পাঠক এখনও বই পড়তে ভালোবাসে। তাইতো অগনিত মানুষের ঢল নামে মেলায়। অনেকের ধারনা বই পড়ায় আগ্র এখন নিম্নমুখী। কিন্তু তিনি এই তথ্যের সঙ্গে সহমত পোষন করেন না। নারায়ন বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস বইয়ের প্রতি তীব্র ভালোবাসা, হৃদয় সঞ্জাত আগ্রহের জন্যই দিনের পর দিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বইমেলা, পাঠকের ইড় বাড়ছে এখানে। বাঙালীরা আর উৎসব প্রবন। তাই তো বইমেলা বাৎসরিক উৎসবে পরিনত হয়েছে।

তিনি কোন ধরনেরবই পড়তে ভালোবাসেন জিজ্ঞেস করলে তিনি জানা ডিটেকটিভ বই এর তিনি ভীষন ভক্ত। দীনেশ রায়ের লেখা রহস্য কাহিনী তাঁকে খুবই আবিষ্ট করে রাখে। প্রফুল্ল রায়ের লেকার প্রতি রয়েছে তাঁর সহজাত আকর্ষন। আসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় প্রফুল্ল রায়ের বিভিন্ন রচনা ছিল তার একান্ত সাথী। সময় পেলে মুস্থাফা সিরাজের কর্নেলেও তিনি ডুবে থাকেন।

হাঁদা ভোঁদা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় - এই দুটো চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটা? আর হাঁদা কেন ভোঁদার কাছে সবসময় পরাজিত হয়?

হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে, বাটলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র বেছে নিতে অবশ্যই তিনি দ্বিধার সম্মুখীন হন। জানা তিনি বাবার কাছে সন্তানি যেমন সমান - তার অপত্য স্নেহে জড়িত তার সৃষ্ট সব চরিত্র গুলোই তাঁর কাছে সমান প্রিয়। তবে তাঁর বিশ্বাস, বাটুল তার সবচেয়ে জনপ্রিয় সৃষ্টি। বাটুল দি গ্রেট রচনার ৫০ বছর পূর্তিতে তিনি বিশেষ পুরষ্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

নারায়ন বাবু ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন -

১৯৫৭ সালে বাড়ির সামনে সিঁড়ির উপর বসে রাজপথে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের খেলাধলা অভিনেএশ সহকারে পর্যবেক্ষন করতেন তিনি। সে সময় এতো গাড়ির প্রচলন ছিলনা। ছোটো ছেলেমেয়েরা প্রায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাস্তায় বেড়াত। তাদের পারস্পরিক কলহ, মারামারি, পথচারীদের নানাভাবে উত্তক্ত করা দেখতেন তিনি। তাঁর রসপিপাসু মনে আনন্দের জোয়ার বইত ল আর এ রকমই খন্ড খন্ড অভিজ্ঞতার ঝুলির তলদেশ থেকে হাঁদা ভোঁদাকে তুলে আনেন পাঠকেদর সামনে।

টিপ্পনী

একান্ত আলাপচারিতায় তিনি জানিয়েছেন পরবর্তী জীবনে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ঘটেছে অনেক - রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর - লোকসংখ্যা যেমন বেড়েছে পথের সোড়গল ও বেড়েছে অনেক বেশি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশ থেকে উঠে আসা তাঁর কল্পনার রঙে রঙিন চরিত্রগুলো পাঠকের হৃদয় অমরতা লাভ করেছে।

বইমেলায় প্রতি বছর তাঁর বই এর বিক্রি এড়েছে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন নন্টে ফন্টের ইংরেজী ভাষান্তর কিনে চলেছে। তার ই এর কাটতি দিনের পর দিন উর্দ্ধমুখী প্রকাশক সংস্থাও বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হয়েছে তাঁর রচনা প্রকাশনার মাধ্যমে।

তাঁর উপর বিদেশী কমিকস্ এর প্রভাব

'Tintin', Asterik' - ইংরেজী কমিকস্ ভারতের বাজারে প্রবেশ করে বিগত ৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। আর শ্রী দেবনাথের হাঁদা ভোঁদা শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬২ তে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর লেখা 'Tintin', Asterix' দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভবনা নেই। তিনি জানিয়েছেন 'Prisoners of Sun' এর বাঙলা অনুবাদ 'সূর্যদেবতা বন্দী' তাঁর হাতে এল নাতনির পাওয়া একটা পুরস্কারের মাধ্যমে।

কীভাবে তিনি বাটুল দি গ্রেটের কাজ শুরু করেন?

হাঁদা ভোঁদার জন্মের এক বছর পর বীরোচিত কান্ডের বাটুলের আবির্ভাব। একদিন তিনি কলেজ স্ট্রীট ধরে ফিরছিলেন, তখনই পেশীবহুল , বিশালদেহ, বীর নায়ক বাটুল জন্মনিল তাঁর মনের মন্দিরে। পা দুটো সরু, মুখটি বালকের - কিন্তু অসীম ক্ষমতাধারি অসাধ্য সাধনে পটু। ১৯৭১ সালে বাঙলা দেশের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অপবাদের আটুলকে দিয়ে হররেকরকম মজার ইচ্ছাপূরন হল। বিবাদে ট্যাঙ্ক চালাতে পটু - এক নিঃশ্বাসে কামানের গোলা ছুড়তে দড় - অতিমানবিক শক্তির অধিকারী পরাক্রমশালী বাটুল হয়ে উঠল কল্পজগতের এক অবিস্মরনীয় বীর।

টেলিভিশন চ্যানেলেও বাটুলের আর্বিভাব ঘটেছে সার্থকভাবে। টেলিভিশনে বাটুলকে যিনি সার্থকভাবে তুলে এনেছেন সেই অভিজিত ভদ্রের মতে, বাটুল, হাঁদা ভোঁদা ছাড়া চিত্রমালার ফো তুলে প্রদর্শন করা প্রায় অসম্ভব। টেলিভিশনে সাড়া জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বাটুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

টেলিভিশন চ্যানেলের অনুধান রূপায়নের দায়িতএ থাকা শ্রীমতী তানিয়া চক্রবর্ত্তী মনে করেন 'ছোটা ভীমের' থেকেও বাটুল অনেক অনেক বেশি জনপ্রিয়। কয়েক বছর আগে ২ জন ভদ্রলোক জানা বাটুলের উপর ৯০ সেকেন্ডের একটি ছবিরও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু স্পনসরের অআবে তাদের প্রচেষ্টা জনসমক্ষে উপস্থিত হতে পারেনি।

আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল রেখে শ্রী দেবনাথ বাটুলের হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছেন। মোবাইল ফোনে স্থানীয় যুবকেরা বাটুলকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। আর সময়োচিত যোগাযোগের জন্যই দুষ্টলোকেরা বাটুললের হাতে ধরা পড়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

দেব সাহিত্য কুটিরের বাইরেও তাঁর কমিকস স্থান করে নিয়েছে। ষটার মার্কের শ্রী গৌতম জাটিয়ার মতে লাল মাটি থেকে প্রকাশিত দেবনাথ কমিকস্ ছাপার জন্য পাঠানো হয়েছে। ইংরেজি কমিকস্ সর্বত্রই পাওয়া যায় যাতে এর জনপ্রিয়তা ও বেড়েছে। পত্রভারতী ইংরেজীতে নন্টে ফন্টে প্রকাশ করেছে। ৫ থেকে ৫০ বছরের পাঠকের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে।

শ্রী দেবনাথ যথেষ্ট অবহিত যে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো - হাঁদা ভোঁদা, বাটুল, নন্টে ফন্টে, বাহাদূর বেড়াল, ম্যাঝিসিয়ান পটলচাঁদ, ডানপিটে খাদু আর কেমিক্যাল দাদু - একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই বিস্মৃতির অঞ্চলে তলিয়ে যাবে।

পরম্পরা রক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছুক ছাত্রদের কি শিক্ষিত করেন নি?

শ্রী দেবনাথের মতো কমিকস্ আসে মনের ভেতর থেকে। এটা কাউকে শেখান যায় না। যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আর তার ছায়াই ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে চারদিকে।

নারায়ন দেবনাথ ১৫০০ কমিকসের স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বরেকর্ড অধিকারী। গল্প, কথোপকথোন, বিষয়বস্তু, চিত্রন, অলঙ্করন সবই তিনি একা সামলেছেন।

ভেদা নামে বাটুলের এক পোষা কুকুর আর উটু নামে এক পোষা উটপাখি আছে। লম্বকর্ণ নামে বাটুলের এক সাকরেদের কান দুটো অস্বাভাবিক ভাবে বড়ো আর তার শ্রবণশক্তি ও প্রখর। কলেজ স্ট্রীট থেকে ফেরার পথে তাঁর মননে বাটুলের জন্ম। হাঁদাভোঁদাকে পেন্সিল আর কালির আরবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন কোনরকম রঙের

টিপ্পনী

মিশ্রন ছাড়াই।

টিপ্পনী

তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ ও অলংকরন যেন কথা বলে

নারায়ন দেবনাথের তৈরি যেমন প্রচ্ছদ তেমনি অলংকরন যেন কথা বলে। ইলাস্ট্রেশনের থেকেও তাঁর কমিকস সৃষ্টি যেন মনকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে। সিরিয়াস অথবা হাসির গল্পের যে কোন চরিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। শিকার কাহিনী বা ইতিহাসের কাহিনীও তাঁর অঙ্কন প্রতিভায় পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। তাঁর গ্রন্থ চিত্রনে যে ভিসুযাল ইনফরমেশন পাওয়া যায় তার জুড়ি মেলা ভার।

েকটা সময়ে তিনি অনুবাদ গল্প ও কপাসিক বইয়ের প্রচুর প্রচ্ছদ এঁকেছেন। রবিন হুড, টারজান, হারকিউলিস প্র্যুতি বিদেশী গল্পের চরিত্র তিনি এঁকেছেন অসাধারন নৈপুন্যে। জুল ভার্ন, চার্লস দিকেন্স, লর্ড লিটন, হোমার, শেকসপিয়র, হাওয়ার্ড ফাস্ট, স্টিভেনসন প্রভৃতি লেখকদের বহু বাংলা অনুবাদ বই তিনি অলংকৃত করেছেন।

আবার নির্মল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত কান্তি দত্তর সৃষ্ট মজার চরিত্র ভল্টুদা, মোটাদা, ডালুমাসি, পদ্মপিসি সিরিজের প্রচ্ছদ গুলিতে মোটা মহিলা ও পুরুষের নানারকম মজার ভঙ্গি এঁকে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'ভূত-পেত্নি', 'রাজা-রানী', 'দৈত্যের কেটলী' বাঘ বোয়ালের খেলার প্রচ্ছদ একে পাঠক মনকে আকৃষ্ট করেছেন। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'ভোলানাথের সর্দারি' প্রভৃতি বইগুলির প্রচ্ছদ এঁকে তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৭০ এর দশকে স্বপনকুমার রচিত গোয়েন্দা কাহিনীর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী ও তার সহকারি রতনলালের ছবি এঁকেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভিলেন ড্রাগন, বাজপাখি বা কেলো নেকড়ের ছবি গুলো একে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছেন তিনি। এসব ছবি যেন চোখ থেকে ফেরানো যেতনা।

নামাঙ্কন লিপি বা হেডপিস রচনায় তাঁর নিপুনতাও অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক কাহিনীর মোগল, মারাঠা, শিখ, রাজপুত, গ্রীক চরিত্রগুলোও নিখুত হয়েছে তার রচিত হেডপিস গুলিতে। ক্যালিওগরাফির রকমফের হয়েছে প্রতিটি হেডপিসে। এছেড়া পশ্চাদপটে ডিটেলিং সহ নিখুঁত বন্যজীবের সাদা কালো হেডপিউস তার অনবদ্য সৃষ্টি।

নারায়ন বাবুর সৃষ্ট নিখুঁত ছবি মসৃন কাহিনী। উদ্ভট চমক আর দুর্দান্ত হাস্যপরিহাস নিয়ে সম্ভবত একটা পুরো বই লেখা যায়। কিন্তু সৃষ্টির পরিমান নয়, তার মানই শ্রী দেবনাথকে স্মরনীয় করে রেখেছে। লিপি লিখনেই হোক বা অঙ্কন শিল্পে সমান দক্ষতা তাঁরে। স্বচ্ছন্দ বিচরনী করেছেন সর্বত্র। অথচ প্রতিটি চলন আলাদা, চরিত্র আলাদা, পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা। সে সব এত দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রনে রাখা কি মুখের কথা। আর জনপ্রিয়তা কেবল শিশু পাঠক নয়, বড়োদের মনও তিনি আকৃষ্ট করেন প্রতিনিয়ত। এখানেই তিনি তুলনাহীন, অপ্রতিদ্বন্দী অরন্যদেব, ম্যানড্রেক, অ্যাটেরিকস, সুপারম্যান - সবের থেকে আলাদা তার নিজস্ব ঘরানা।

বিস্মিত হতে হয় তাঁর গল্পের নিটোল গড়নে, প্রতিটি কাহিনীর নিজস্ব দিগবলয়ে। ছবির গতি এবং চমৎকার দৃশ্যকল্প সর্বদাই নতুন নতুন পরিস্থিতিকে জাপটে ধরেছে। বিষয় বৈচিত্রের সঙ্গে তাল রেখে ছবির এমন যুগলবন্দী, বিশ্বের বিরল।

অলংকরন প্রচুর করেছেন তিনি। রঙিন এবং সাদা কালো। নারায়ন দেবনাথ মানেই শিকার কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার, হত্যা রহস্যের বেশ লোমখাড়া করা ছবি। কালো মুখোশ পরা আততায়ী, খুন হওয়া গল গল করে রক্ত বের হওয়া মৃতদেহ কিংবা ভাতের পুরানো বীর পুরুষদের জমকালো পোষাকপরা পেশীবুল চেহারা। ছবিতে অ্যাকশন, আতঙ্ক, নাটকীয়তা বেশ বশি পরিমানেই উপস্থিত।

আর সংলাপের বৈশিষ্ট্য ? সেখানেও শিল্পী নারায়ন দেবনাথের অপূর্ব কৌশল পাঠকের নজর এড়ায় না ল চরিত্রগুলোর মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় নানারকম ছন্দমেলানো সংলাপ। উদাহরন স্বরূপ উল্লেখ করা চলে -

ক. 'বস, তোমার দেখছি দারুন হাতযশ।'

খ. 'বাটুলের হাঁচী থেকে পালিয়ে বাঁচি'

গ. 'বাটুল দাদা, চাই গো চাঁদা',

ঘ. 'এই আলু দিয়েই ওদের তালু ফুটো করে দেবো।'

ঙ. 'আমাদের দাবী সিন্দুকের চাবি।'

চ. 'ইকি রে দাদা। এ যে স্রেফ কাদা।'

টিপ্পনী

ছ. ‘কর না দিলে ব্যাটা গুলি খেয়ে মর।’

টিপ্পনী

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলা কমিকসে এ ধরনের ছড়া করে বাক্যালাপের নারায়ন বাবুর রচনা শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আবার এই সংলাপই কখনও হয়ে ওঠে হিন্দি ও বাংলা মিশ্রনে এক মিত্রভাষা। যেমন -

ক. ‘বাঁটোলবাবু তুমি ঘন্টিরামকো লে যাইয়ে, ওহি দো মাস্তানকো সিধা কর দেগা।”

খ. ‘আজ কা দিন বহোত আচ্ছি হ্যায়। কুছ ঝামেলা উমেলা নেহি।”

নারায়ন দেবনাথের কমিকসগুলো হাস্যরসোদীপক হয়ে উঠেছে নানা কারনে। তার ভেতর ছিলল তার অদ্ভুত কয়েকটি শব্দের সম্ভাষন। যেমন দামড়া, বেল্লিক, হতচ্ছাড়া, বিটলে, মর্কট ইত্যাদি।

নারায়ন বাউ বিখ্যাত অনেক লেখকের রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর বইতে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। শুকতারার ভৌতিক সংখ্যাতে তার আঁকা প্রচ্ছদগুলো অসাধারন। দেখলে গা শিউরে ওঠে।

নারায়ন বাবু তাঁর নিজস্ব স্টাইলে এঁকেছেন সেগুলো, যার ভেতর আমরা পাই কবরখানা, রাতপ্যাঁচার দৃশ্য, পরিতাক্ত কেল্লা আবার ডুবন্ত সূর্যের আবছা আলোয় মোছোভুতের চাউনি। এগুলো সবই নারায়নবাবুর নিজস্ব স্টাইড।

বাঙালির অতিপ্রিয় গোপাল ভাঁড়ের ছবিটি নারায়ন বাবুর এক অবিস্মরনীয় সৃষ্টি। ১৯৭৪ সালে এটি প্রথম তিনি আঁকেন ইর্মল বুক এজেন্সির প্রকাশিত একটি পুস্তকে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক শিল্পীই গোপাল ভাঁড়ের এই অবয়বটিই অনুকরন করেছেন।

নারায়ন বাবুর করা প্রতিটি প্রচ্ছদ এবং অলংকরনে চরিত্রের চেহারা, সাজপোষাক ও পারিপার্শ্বিক ডিটেলস আমাদের চিরকালীন সম্পদ।

বন্য জীবজন্তুর নিখুঁত ও পরিষ্কার ছবি আঁকাবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে উপযুক্ত রেফারেন্স খুঁজে স্টাডি করেছেন অসীম ধৈর্য্য নিয়ে ল বাঘ ছাড়াও গরিলা, আফ্রিকান হাতি, বন্য মহিষ, বাইসন, ভাল্লুক, ডাগ্রন, বন্য শুয়োর, ঘোড়া প্রতিটি জন্তুর ছবিই শতকরা একশ

ভাগ নিখুঁত তার তুলিতে। রীতিমত গবেষনার বিষয় হতে পারে নারায়ন বাবুর সৃষ্টি।

নারায়ন বাবুর সৃষ্টির প্রাচুর্য্য যথার্থই বিস্ময়কর। হাঁদা ভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট, বাহাদুর বিড়াল, পটল চাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান, ডানপিটে খাদুর মতো কমিকসের পাশাপাশি একে যান রহস্যময় অভিযাত্রী, গোয়েন্দা কৌশিক, হীরের টায়রা, ইন্দ্রজিত রায় - ব্লাক ডায়মন্ডের সিরিয়াস নভেলধর্মী কমিকস। বিষয় বৈচিত্র্যে ও ধারাবাহিকতায় নারায়নবাবু হয়ে উঠেছেন বাংলা কমিকসের একচ্ছত্র অধিপতি।

আলো ছায়ার অদ্ভুত মিশ্রন আর কালো রঙের ব্যবহারে তিনি নোয়েল সিকেনস্, জন প্রেনটিস বা মিললটনের ক্যানিকের সমগ্রোত্র।

অ্যাকশনধর্মী ছবি বা রাতের দৃশ্যে গাঢ় কালো রঙের ব্যবহারে নিজেকে প্রায় এপিকসন উচ্চতায় নিয়ে যান নারায়ন দেবনাথ।

তবে আজও আপামর বাঙালী তাকে মনে রেখেছে তার অমর কমিকসগুলোর জন্য। হাঁদা ভোঁদার জয় গল্পে হাঁদার অ্যালবোট স্টাইলের চুল পাঠকদের মধে খুবই জনপরিয় হয়। আবার শ্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পরে হাজির হয় বাঙালির অতি প্রিয় চরিত্র অসীম শক্তির বাটুল। ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের সময় শত্রু সেনার ট্যাঙ্ক, গুলি গোলা ধ্বংস করে তাদের প্যাটল ট্যাঙ্ক নিয়ে তাড়া করে তুঙ্গ স্পর্শ। জনপ্রিয়তা লাভ করে বাঁটুল। ওয়স-আঞ্চস-উরফ্-ফরাৎ - ইরক - এমন সব শব্দ নিয়ে প্রায় পঞ্চাশের দোর গোড়ায় পৌছান বাটুল আজ আপামকর বাঙালির ফেবারিট চাইল্ড।

নারায়ন বাবুর আর একটি অসাধারন সৃষ্টি হল যে কমিকসের মধ্যে যে লেখাগুলো বেলুনের মধ্যে থাকে সেগুলো উনি সরি তুলি দিয়ে হাতে লিখেন। এমন কি পেলের সাহায্য ছাড়াই। অন্য শিল্পরা তো টাইপ করে দেন। আসলে নারায়নবাবু নিজেকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যেখানে টিনটিন বা অ্যার্চি, বেতাল বা ম্যানড্রেক কেউ কিন্তু ওর ধারে কাছে পৌঁছতে পারেন নি।

বাটুল একটি বাঙালি চরিত্র এবং বাঙলি সমাজে অসম্ভব জনপ্রি চরিত্র। তবে সে সাধারন একজন ভেতো বাঙালীর পর্যায়ে কখনই পড়বে না ল কালো হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বুক ফুলিয়ে চলা বাউলকে দেখলেই পাঠকের মনের মধ্যে জেগে ওঠে অসম সাহসী বায়ামবীরদের কথা। আমাদের এই বাংলা দেশেও খাতনামা। কয়েকজন বাঙালী ব্যায়ামবীরদের চেহারা এখনও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনোহর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আইচ, মনতোষ রায়, নীলমনি দাস, বিষ্ণুচরন ঘোষ প্রভৃতি প্রখ্যাত বায়ামচার্যদের নাম আমরা জানি।

বাঁটুলের ছবি দেখে, তার সাহসিকতা দেখে আমাদের বাস্তব জগতের ওইসব লৌহ মানবদের কথাই মনে এসে যায়। বাঁটুল লড়াই করে, ভূতকে সে ভয় পায় না - মস্তানদেরও ছেড়ে কথা বলে না। উত্তম-মধ্যম দেয়। এমন কি - বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সে পেছপা হয় না। ফুঁ দিয়ে সে গোলা উড়িয়ে দেয় হাতের শক্তিতে বিরাট প্রাসাদ নাড়িয়ে দেয়।

বাঁটুল একই সঙ্গে বাস্তব আর অবাস্তবকে ছুঁয়ে থাকে। সাবলীলভাবে ভূতকে পেটাতে তার জুড়ি নেই - রাজসেনা কে দুরমুশ করা সে দ্বিধা করে না। তার শট মারা বল অনায়াসে পৌঁছে যায়, স্ট্যাটোফিয়ারে, ছিপ দিএ সে ধরে ডুবো জাহাজ, আর এক লাথিতে ভেঙে ফেলে উঁচু মিনার। এ হেন শক্তিধর বাঁটুল তো শিশুমনকে আকৃষ্ট করেই। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল ভেঙ্গে বাঁটুল আজ আধুনিক এক রূপকথার চরিত্রে পর্যাবসিত হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে নারায়ন বাবু সৃষ্টি করেছেন বাঁটুলকে। সত্যিই সে গ্রেট।

বাংলা কিকসের জগতে যেন এক মহীরুহের মতো শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছেন নারায়ন দেবনাথ তাঁর রেখায় আর লেখায়। তাঁর কমিকস থেকে সেরা প্রাপ্তি যেন তাঁর আঁকা ছবি। যা দেখলে আপনিই হাসি চলে আসে এবং তেমনি তার লেখা দুর্দান্ত সমস্ত সংলাপ।

প্রধান শিক্ষককে দেওয়া হাঁদ-ভোঁদার উপহারটি নিয়ে ঘটেছিলল এক মজার ঘটনা। উপহারের বাক্সটি ছিল একটি কেকে বাক্স, কিন্তু ভেতরে ছিল স্প্রিং লাগানো একটি দস্তানা যেখানে চাপ লাগলেই চোখে সর্ষেফুল। কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে বাক্সটি গিয়ে পৌঁছল থনার বড়বাবুর কাছে। হাঁদা ভোঁদা থানায় গিয়ে বড়বাবুর কাছে বাক্সটি দাবী করল। এবার নারায়নবাবুর সংলাপ-

থানার বড়বাবু : 'বোলো ইসকো ক্যায়া হ্যায়?"

হাঁদা : 'ও ..... তো কেক, বিস্কুট, মিষ্টি এইসব হ্যায়।'

বড়বাবু : 'ঠিক হ্যায়, হামি পেহলে খুলকে দেখি'

হাঁদা : ((বিপদ বুঝে) "খেয়েছে - ভোঁদারে, লিগ স্পিড় বাড়িয়ে দে।"

নারায়নবাবুর এরকম সংলাপ সৃষ্টি অবিস্মরনীয়। শিশু, বয়স্ক সকল পাঠকই এখানে না হেসে পারবেন না ল হাসির কথায় মনে পড়ে যার লঙ্কার গুড়ো মেশানো দুধ খেয়ে কেল্টুর সেই পা তুলে নাচের কথা। নারায়ন আবুর সংলাপ:

টিপ্পনী

স্যার : "এ কি রে! তুই নাচ জুড়েছিস কেন? হাতেই বা ওটা কীসের নল?"

ফন্টে : "ওটাই তো স্যার গ্যাড়াকল, ওই পাইপ লাইন বেয়েই তো দুধ আসে।"

এইসব দুর্দান্ত সংলাপ রচনা নারায়নবাবু জনপ্রিয়তার অন্যত বৈশিষ্ট্য।

ব্যাক্তি নারায়ন দেবনাথ

নারায়ন দেবনাথের জন্ম হয়েছিল ১৯২৫ সালের শরৎকালে, হাওড়া জেলার শিবপুর শহরে। পৈত্রিক বাড়ি ৫২।২, শিবপুর রোড়ে। যে বাড়িতে এখনও তিনি থাকেন।

তাঁর বাবা শ্রী হেমচন্দ্র দেবনাথ এবং মায়ের নাম শ্রমতী রমনসোনা। স্বাধীনতা লাভের অনেক আগেই বাংলাদেশের বিক্রমপুরের মুন্সীগঞ্জ থেকে পিতা হেমচন্দ্র এদেশে চলে এসে শিবপুরে ভাই এর সঙ্গে কমলা শিল্পালয় নাম দিয়ে সোনার দোকান করেন।

স্বর্নশিল্পী হেমবাবুর একমাত্র পুত্র নারায়ন দেবনাথ। নারায়ন বাবু ছোটো দু বোন আছে।

শৈশব থেকেই নারায়নবাবু কম কথা বলতেন। ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। সাঁতার কাটার অভ্যেস ছিল তাঁর। বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গা নদী সাঁতরে এপার ওপার করতেন।

হাওড়া জেলার বি. কে পাল ইনস্টিটিউশনে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। তারপর ভর্তি হন Indian Art Collage এ Fine Arts এর প্রশিক্ষন নিতে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম তারা দেবী। নারায়নবাবুর এক মেয়ে ও দুই ছেলে।

মানুষ হিসেবে অতন্ত শান্ত স্বভাবের তিনি। বেশ মজা করে কথা বলেন।

বরাবরই তিনি কাজের মানুষ। কাজের প্রচন্ড চাপে রাত দুটো, আড়াইটে এমনকি

ভোর রাত অবধি এক সময়ে আঁকতেন। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করাও ছিল তার পচ্ছন্দ।

টিপ্পনী

একসময়ে ইংরেজি সিনেমার খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। বিশেষ করে অ্যাকশন ছবির। আর বই পড়ার নেশা ছিল খুব। পচ্ছন্দ করতেন গোয়েন্দা গল্প।

আজ তার বয়স ৯১, বয়সের ভারে অনেক অভ্যেসই পরিত্যাক্ত হয়েছে। কিন্তু বাক্তি নারায়নবাবু এখনও সম্পূর্ন মুক্ত মনের মানুষই রয়ে গেছেন।

৯১ বছর বয়স হলেও এখনও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষ হিসেবে খুনই নরম প্রকৃতির সৎ মানুষ।

৯১ বছর পর্যন্ত আপন মনে তাঁর লেখা এবং আঁকা চালিয়ে যাচ্ছেন। এধরনের মানুষ এই পৃথিবীতে ক'জন আছেন ? বিদেশেও তৈরি হয়, নানারকম কমিকস্। অনেক লোক সেখানে - একটা পুরো টিম ওয়ার্ক কাজ করে - সরকারী নানারকম সাহায্যেও তাঁরা পান। কিন্তু নারায়ন বাবু একা। সবরকম সরকারী সহযোগিতা থেকে তিনি বঞ্চিত। একক স্রষ্টা তিনি।

ব্যাক্তিগত জীবনেও একা থাকাটাই তাঁর পচ্ছন্দ। নারায়নবাবু হইহট্টগোলে যতে ভালোবাসেন না। কারও সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারেন না। এ একেবারে তার স্বভাবের বিপরীত।

নারায়নবাবু লিখেছেন হাঁদা ভোঁদার কাহিনী বাটুল দি গ্রেটের স্রষ্টা তিনি। কেবল এই দুটি গ্রন্থই তাকে অসম্ভব জনপ্রিয় করেছে। কিন্তু তবু তিনি থেমে যাননি। এগিয়ে চলাই যে তার জীবনের মন্ত্র। নতুন থেকে নতুনতর আনন্দের খোঁজ করাই তাঁ জীনের বরত। তাই তিনি সৃষ্টি করেছেন ডানপিটে খাদু, আহাদুর বেড়াল, গোয়েন্দা কৌশিক, শুটকি-মুটকি, পটল চাঁদের মতো আরও অনেক কমিকস্।

শিশু সাহিত্য একাড়েমি থেকে ২০১৩ সালে বঙ্গবিভূষন উপাধি তিনি পেয়েছেন। আর 'বাটুল দি গ্রেট' এর ষাট বছর পূর্তির সময় রাষ্ট্রপতির পুরষ্কার ও পেয়েছেন তিনি।

শৈশবে ব্যায়াম করা ঝোঁক ছিল। বডি বিল্ডার হোয়ার স্বপ্ন ছিল বলেই নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন।

গানের গলাও ছিল অসাধারন। শান্ত নিরহংকার প্রচার বিমুখ এই মানুষটি সরকারী

খ্যাতি বিশেষ না পেলেও আপমর বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা অর্জন করেছেন। বাংলা কমিকস রচনায় নারায়ন দেবনাথ এক জীবন্ত কিংবদন্তী ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।

টিপ্পনী

বোলতা ছদ্মনামেই তিনি প্রথম শুরু করেন হাঁদা ভোঁদা লিখতে। হাঁদা ভোঁদার ছেলেমানুষী গল্পগুলো প্রথম থেকেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে।

বাংলা কমিকস এর জনক বলা চলে নারায়ন দেবনাথকে। ১৩৫১ সালে 'শুকতারা' পত্রিকায় 'ভোঁদার ভোজবাজী' নামে প্রথম ভোঁদা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। তারপরে এল হাঁদা চরিত্র। কমিকসটি নাম ছিল হাঁদার এক্সপেরিমেন্ট। এরপর থেকে হাঁদা ভোঁদা দুটো চরিত্রই একসঙ্গে একই রচনায় যক্ত হল। এদের দুজনকে নিয়ে প্রথম যে কমিকসটি প্রকাশিত হল, নাম তার 'হাঁদ ভোঁদার ক্রিকেট খেলা'। দুটো চরিত্র সৃষ্টির পেছনেই শিল্পী নারায়নবাবুর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর আন্তরিকতা ছিল। এদের সব গল্পগুলোই হাস্যরসোদ্দীপক। লেখকের সংলাপ রচনার ক্ষমতাও অসাধারন।

নারায়নবাবুর সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও জনপ্রিয় চরিত্র হল বাঁতুল দি গ্রেট। 'শুকতারা' মাসিক পত্রিকার পাতাতেই বাঁটুলের আবির্ভাব। তখন আর বোলতা ছদ্মনামে নয় ছবির সঙ্গে কেবল সই থাকত 'না'।

বাটুল ছিল অসাধারন শক্তির অধিকারী। হাঁচি দিয়ে মানুষকে উড়িয়ে দিতে পারে, লাঠির আঘাতে সে পাহাড় টলিয়ে দেয়। ভূতকে সে ভয় পায় না, বড়ো বড়ো মাস্তানকেও সে সহজেই কাবু করে ফেলে। আর বাঁটুলের গল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে নারায়নবাবুর কৌতুককর সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। নারায়নবাবু পরিচয় কেবল কৌতুককর গল্পকার যার নিদর্শন কাহিনী গুলির সংলাপের মধ্যেই রয়েছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে যখন এদেশের যুদ্ধ চলছে তখনও এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাটুলকে আমরা সক্রিয় হতে দেখি।

পাকিস্তানের যুদ্ধ ত্যাঙ্কে যখন আসছে সেটাকে বাঁটুল ধ্বংস করেছে, ওরা যখন কামানের গোলা ছুঁড়ছে, তখন সেটাকে ধরে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিচছে বাঁটুল। ওদের প্লেন যখন ওমা ফেলতে এদিকে আসছে - বাটুল সেই প্লেন ধরেই আটকে দিচ্ছে। অসম্ভব শারিরীক ক্ষমতার অধিকারী সে।

টিপ্পনী

চলন্ত ট্রেনের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় সে। তার ফলটা কী হয়? দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা ট্রেনটা বাঁটুলের সঙ্গে ধাক্কা যাবার জন্য তার ইঞ্জিন টাই যায় ভেঙে। আর ওই প্রচন্ড ধেক্কায় ট্রেনটা বেশ কিছুটা পিছু হটে গিয়ে এলিয়ে পড়ে।

কেবল অসম্ভব শারিরীক শ্তির অধিকারীই নয় সে, অগাধ বুদ্ধিও আছে তার। পথে যেতে যেতে তার মনে হল গরম জলের ধারা স্নান দরকার। একটু এগিয়ে দেখতে পেলে পথের একপাশে কয়েকটি পাইপের ওপরে রয়েছে একটি জলের ট্যাঙ্ক। বাটুল এবার কিছু কাঠ সংগ্রহ করে পাইপের নিচে আগুন ধরিয়ে দিল। আর মাঠের ভেতর দেখল অনেক নুড়ি পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মুখ ভর্তি করে সেই নুড়ি পাথর গুলি তুলে ফু দিয়ে ট্যাঙ্কের তলার দিকে ছিটিয়ে দিল। তারপর ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেল। বাটুল তার নিচে দাঁড়িয়ে চমৎকার ওই গরম জলের শাওয়ারে স্নান করে নিল।

নগর, গ্রাম, পাহাড় সমুদ্র, গলি, রাজপথ এ সবই এসেছে নারায়ন দেবনাথের সৃষ্টিতে। হাঁদা-ভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট বাঙালি জীনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। পুলিশ, আইনকর্তা, দারোগা, হাবিলদার, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, ব্যবসায়ী - কোনও চরিত্রই বাদ যায়নি তাঁর কমিকস থেকে।

সোনার দোকানের মালিক, আঙ্কের কর্মচারী, ঠেলাগাড়ি চালুক, ভ্যানগাড়ির ড্রাইভার, বজরা চালক, অ্যাম্বুলকেন্স চালক - কে নেই কমিকসে।

কমিকসে আছে পাম্পের কর্মী, শোরুমের সেলসম্যান প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র। আরো সব চরিত্রই এসেছে বাটুল চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। বাটুলের ওই বলিষ্ট চেহারা ওই বুদ্ধিদীপ্ত আচরন বাঙালি পাঠকমনে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে নারায়নবাবুর অসাধারন সৃষ্টির মাধ্যমে। দীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলার ব্যঙ্গচিত্রকে শ্রদ্ধা করে যাচ্ছেন নারায়নবাবু। তিনি একাধারে কমিকস শিল্পী, প্রচ্ছদ শিল্পী, গ্রন্থ আলংকারিক তথা হরফ শিল্পী ও বিরল প্রতিআর অধিকারীএক শিশু সাহিত্যিক।

নারায়ন দেনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গুনী মানুষের অভিমত

[কিঞ্জল পত্রিকার নারায়ন দেবনাথ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান - সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

নারায়ন দেবনাথ বুদিন ধরেই বাঙালিদের ছোট বড় সবাইকে বহু আনন্দ দিয়ে

চলেছেন তাঁর আকার মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্টিগুলো আমি মনে করি অনবদ্য। শুধু হাস্যবশের জন্য নয়। টাঁর কমিকসের মাধ্যমে তিনি শিক্ষনীয় অনেককিছু দিয়ে গেছেন। তার আঁকায় জাতির একটা এগিয়ে যাবার পথ নির্দেশিত থাকত। আগেকার দিনে ছোটদের পত্রিকায় নিয়মিত দেখতাম তাঁর আঁকা। তিনি সত্যিকার একজন গুনী শিল্পী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারেনা। নারায়নবাবু তাঁর জীবদ্দশায় নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছেন। একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ। তিনি সুস্থ থাকুন। আরও দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে আনন্দদান করুন তাই কামনা করি। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার তার প্রতি জানাই।

অসম্ভব ভাল সেন্স অফ ইউমার - সন্দীপ রায়

ওনার সম্পর্কে তো বলার অনেক কিছুই আছে। এই যে হাঁদা ভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট এগুলো পড়েই তো বড়ই হয়েছি। আমার খুব ভালো লাগে ওনার কাজ। বিশেষ করে সিরিও কমিক, সেটা আমার এত ভালো লাগত খু কলিন এবং খুব বাঙালিয়ানা থাকত। ওনার বেলুন এর লেখাগুলো এত পরিষ্কার এবং ডায়ালগগুলো এতো ঝরঝরে তা ভাবা যা না। অসম্ভব ভালো ডায়ালগ। গল্প ফাঁদার ব্যাপারটাও ওনার এত সুন্দর ছিল। সবথেকে বড় কথা কমপ্যাক্ট। সত্যি কথা বলতে কি ওনার সিরিও কমিক কাজ আমার অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে। ওই দিক থেকে খুবই মেমোরেবল মনে হয়। বিশেচ করে বেলুনের এতো পরিষ্কার লেখা কিন্তু আমি আর কারুর দেখিনি। একমাত্র ময়ূখ চৌধূরী ছাড়া। এতো কলোকিয়লে এতো মজাদার লেখা কিন্তু নারানবাবু ছাড়া আর কারুর কাছে পাইনি। লেখার স্টাইলটাই আকৃষ্ট করে রাখত। শেষে ওই যে 'না' লেখা সিগনেচার সব মিলিয়ে একটা অদ্ভূত আনন্দের জায়গা। খুবনস্টালজিয়ায় আমরা ভূগি। বিশেষ করে নন্টে-ফন্টে, বাটুল দি গরেট, হাঁদা ভোঁদা। ওর সিরিয়াস কাজও অনেক আছে। তবুও আমার ওনার সিরিয়াস কাজের থেকে এই সিরিও কমিক কাজগুলোই অনেক বেটার লাগে। কারণ ওর ওই কাজগুলো পড়েই বড় হওয়া। তারপর তো শুকতারা, কিশোরভারতী এগুলো আছেই। স্বপনকুমারের বইয়ের কভার করা ও আরও অনেক ইলাস্ট্রেশন।

আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই যে এই এতো বছর বয়সেও ওনার সেই ঝরঝরে কনসিসটেনিস লেখার বাপারটা বয়ে গেছে। এটা একেবারে নমস্য বাপার। অসম্ভব ভাল সেন্স অফ হিউমার। দুপাতার গল্পও জমিয়ে দিছেন। চারপাতার গল্পও জমিয়ে দিচ্ছেন। বাংলা ভাষায় আরও কেউ সিরিও কমিকে এভাবে মনোনিবেশ করলেন না। পি সি এল, শৈল চক্রবর্তী শুরুর দিকে কমিক স্ট্রিপ শুরু করলেও সব থেকে লং - রানিং সবথেকে সাকসেসফুল হচ্ছেন নারায়ন দেবনাথ ঐ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এখনও আরও বেশি করি পড়ি - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমি ওনার হাঁদা-ভোঁদা, আটুল পড়তাম। এখন আরও বেশি করে পড়ি। ওনার কমিকসের যেটা বিশেষত্ব যে সলিড গল্প যা বক্স এ করা থাকে, যা ঝট পট করে পড়ে ফেলা যায়। এরকম সলিড় গল্প না হলে কমিকস হয় না। তাঁর সৃষ্টির আমি একজন আগ্রহী পাঠক। তাঁকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই। তিনি দীর্ঘজীবি হন।

[২৪ঘন্টা চ্যানেলে১৫.১২.২০১৩ তে সঞ্চারিত]

আরও অনেক বছর ধরে ওঁর কমিকস স্ট্রিপ দেখতে চাই - অমল চক্রবর্ত্তী

নারায়ন দেবনাথ কার্টুন কমিকস স্ট্রিপের এক অসাধারন শিল্পী। প্রায় চার দশক ধরে তাঁর অনবদ্য কমিকস স্ট্রিপগুলো লক্ষ্য করছি। নারায়নবাবু শুকতারা, নবকল্লোল, কিশোর ভারতী এবং নানা পূজাবর্ষিকীতে তাঁর অনবদ্য কার্টুন ইলাস্ট্রেত হিসাবে তার কাজের কোন তুলনা নেই। বিশেষ করে টারজানের কাহিনীগুলোতে তাঁর ইলাস্ট্রেশান বিশ্বমানের। অন্তত আমি তাই মনে কর। আমাদের এক্ষনে নিয়মিত স্ট্রিপ কার্টুনের খুবই অভাব। ৫০/৬০ দশকে কিছু সময় শৈল চক্রবর্তীর আঁকা Little Dakoo (অমৃতবাজার) আর পি সি এলাএর আঁকা খুঁড়ো (অমৃতবাজার) শেয়ান পন্ডিত (যুগান্তর) আমরা দেখতাম কিন্তু বছরের পর বছর নারায়ন বাবুর 'হাঁদা ভোঁদা' 'নন্টে ফন্টে, বাটুল দি গ্রেট, স্ট্রিপ কার্টুন এক অনবদ্য সৃষ্টি। কাগজ খুললেই যখন বিদেশী কমিকস স্ট্রিপের ছড়াছড়ি দেখি তখন নারায়নবাবুর ওই স্ট্রিপগুলো এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবেই হাজির হয়। ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই অসম্ভব জনপ্রিয় এই স্ট্রিপগুলো। নারায়নবাবুর কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের ভেতরের 'হাঁদ-ভোঁদা', 'বাটুল দি গ্রেট' কে অনায়াসে তিনি টেনে বের করেন। আরও অনেক অনেক বছর ধরে ওনার কমিকস স্ট্রিপ দেখতে চাই।

গুণী শিল্পী - চন্ডী লাহিড়ী

শিল্পী নারায়ন দেবনাথ বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ো। এখনও এই পরিনত বার্ধক্যে ছোটো ছেলে মেয়েদের জন্য ছবি আকার যে নিষ্ঠা নি্যনতুন ভাএ দেখিয়ে চলেছেন সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় গোটা বিশ্বে এক বিস্ময়। গোটা বিশ্বে অবশ্য তার নাম ছড়ায়নি, সেটা বাইরের দুনিয়ার লম্বা, নারায়ন বাবুর নয়। শ্রষ্টার বয়সের জন্য টিনটিন বন্ধ হয়ে গেছে। নারায়নবাবু বয়সের কাছে হার মানেন নি। বড়ো দৈনিকটি টিনটিন নিয়ে হইচই করছে। নারায়নকে তাদের মনে পড়েনি। আমাদের এই কলকাতা শহরে কার্টুন স্ট্রিপের ইতিহাস

বেশি পুরাতন নয়। আমার চোখের সামনেই সব কিছু ঘটেছে। কাফি খাঁ অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী প্রথ যুগান্তরের জন্য পাতা জোড়া কার্টুন স্ট্রিপ আঁকেন। বিরুসাওয়ালা কথা নাম দিয়ে। অনেক মজার স্ট্রিপ চালু রাখেন। একটি বড়ো সংবাদপত্রের বাঁদিক থেকে ডান দিক পযফন্ত সুদীর্ঘ অঞ্চলকে মাথায় রেখে কার্টুন বানানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

নারায়নবাবু বড়ো পত্রিকায় কমিকস করার জন্য ডাক পেয়েছিলেন ছোটো পত্রিকা তাকে বিখ্যাত করার পর। গুনী শিল্পী দুঃসময়ে বন্ধু ছোটো পত্রিকা কিশোর ভারতী শুকতারা এবং দেবসাহিত্য কুটীরে র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। এই বিশ্বস্ততার জন্যও তিনি আমার শ্রদ্ধেয়।

আমাদের দেশে কার্টুন স্ট্রিপ বাণিজ্যিকভাবে সফল না হবার কারণ বাংলা বা হিন্দি ভাষার সফল এবং উদ্যোগী পত্রিকা নেই। কিংফিচার্স সিন্ডিকেট যখন কোনো শিল্পীর ছবি ইংরেজীতে সারাবিশ্বে অন্তত দু-হাজার ইংরেজি পত্রিকায় ছাপা হয়।

টিনটিন এবং অ্যাসটেবিক্স দুটোই শুরুতে ফরাসি জার্মান সুইডিশ এসব ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল অনেক পরে। আজ ইংরেজিতে অনুবাদের ফলে ভারতের বিপুল সংখ্যক পাঠকের প্রিয় পাঠ্য হয়ে ওঠে।

নারায়নবাবু শুরুতে ইংরেজির আনুকূল্য পাননি। এখন অবশ্য ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে বলে শুনেছি। স্বীকা করতেই হবে - বৃহৎ হাউসের পৃষ্ঠপোষন না পেলেও নারায়ন দেবনাথ আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত।

বাংলা সাহিত্যের গুনগতমনে এখন কুবই নিম্নগামী। আর্থিক দিক থেকেও লোকসানের পথে তবে এখন ছোটরা ঝুকছে কমিকসের দিকে। সেটা খুবই সুলক্ষন। লেখক নয়, চিত্রকররাই এখন সাহিত্যের প্রধান কান্ডারী। নারায়ন দেবনাথ তা প্রমান করেছেন। শিশু সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে তাকে চিত্রনির্ভর হতে হবে। একদা সুকুমার রায় সেই পথ দেখিয়েছিলেন। নারায়নবাবু আমাদের শেষ ভরসা। বয়সের জন্য যেন তাঁর সৃষ্টিশীলতা কমে না যায়।

হাস্যরসাত্মক যা লেখেন তা জীবনের প্রতিচ্ছবি - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নারায়নবাবু বহুদিন ধরেই বাংলা শিশু সাহিত্যের অনেকখানি জুড়েই রাজত্ব করছেন। তিনি এবং তাঁর সৃষ্টিগুলি এখনও আগের মতোই প্রাসঙ্গিক। তার হাসভরসাত্মক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রচনাগুলি যেহেতু পুরোপুরি বঙগজীবনের নির্যাস থেকে নেওআ । তাই তাদের ভালোবাসার রেশ থেকে যায় সবসময়ই । আমরা বাংলা মানুষেরা আরও বেশি অনুভব করতে পারি নন্টে ফন্টে, হাঁদা-ভোঁদার দুষ্টুমি । বাটুলের খামখেণয়ালিপনাকে তার সাথে যোগ করা যায় প্রত্যেকটি চরিত্র সৃষ্টিতে নারায়নবাবুর তুলির কথাও । সবকিছু মিলিয়ে কমিকসগুলি ভালোলাগার রেশ থেকে যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং আগত প্রতিটা দিনের ক্ষেত্রেও। সেখানে, আজ ভালো লাগছে না, আগে ভালো লাগত ব্যাপারগুলো যথেষ্ট অপ্রাসঙ্গিক।

নারায়নবাবু যে শুধুমাত্র শতকরা একশোভাগ বাঙালিয়ানা বজায় রেখে বাংলা কমিকসকে বেঁচে থাকার জন নিত্যনতুন রসদ জুগিয়ে যেচ্ছেন তার জন কোন প্রশংসাই সম্ভবত যথেষ্ট নয়। এখনও অবধি বাঙালি শিশু পাঠকদের কাছে বাংললা কমিকসের যেটুকু লড়াই তা নারায়ন দেবনাথের সৌজন্যই। ওনার হাস্যরসাত্মক সৃষ্টিগুলি না থাকলে লড়াইটা হয়ে যেত বড় অসম, বড়ই একপেশে। আজকালকার অভিভাবকরাও কিন্তু এ ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আজকের বাংলা শিশু সাহিত্য জগত খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। বইমেলার ওই দুর্দান্ত ভিড় মাথায় রেখেও বলা যায়, ক্রমশ একটা কোনঠাসা জায়গায় চলে যাচ্ছে বাংলার শিঈশু সাইত্য এবং কমিকস । সেখানে নারায়ন দেবনাথের মতো লোকের আছেন বলেই পুরো জগতটাই লড়াই চালিয়ে যেতে পারছে। আজকের এই প্রল টেনশনের যুগেও ওঁদের মতো মানুষেরা আছেন বলেই সম্ভবত ‘প্রাণখোলা হাসি’ ব্যাপারটাও রয়ে গিয়েছে । এখানেই নারায়ন দেবনাথের অনন্যতা । এখানেই তাঁর জয়।

সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নারায়ন দেবনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দাও।

২। “নারায়ন দেবনাথ অসম্ভব ভালো সেন্স অফ হিউমারের অধিকারী” - মন্তব্যটি বিশ্লেষন করো।

৩। নারায়ন দেবনাথের সৃষ্ট বাটুল চরিত্রটি বিশ্লেষন করে “বাটুল দি গ্রেট’ এর জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করো।

৪। “শিল্পী নারায়ন দেবনাথ হাস্যরসাত্মক যা লেখেন তা জীবনের প্রতিচ্ছবি - মন্তব্যটি বিশ্লেষন করো।

৫। নারায়ন দেবনাথের দুটি কমিকসের পরিচয় দিবে আলোচনা করো ওনার কমিকস গুলো বাঙালির কমিকস হয়ে উঠেছে কেন?

উৎস

১। শিল্পী নারায়ন দেবনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২। 'কিঞ্জল' পত্রিকার নারায়ন দেবনাথ সংখ্যা।

টিপ্পনী

NOTES

NOTES

NOTES